সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ›› তৃতীয় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা ›› আগস্ট ২০১৭ ›› পাঁচ টাকা

ব্রিটিশ শিক্ষকের দৃষ্টিতে নভেম্বর বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়া
পৃষ্ঠা ৩

জাতীয় কমিটির বিকল্প জ্বালানী ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা
পৃষ্ঠা ৭

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা বলে সরকার দায় এড়াতে পারে না
পৃষ্ঠা ৮

ভারতে বিজেপির গো-রক্ষার রাজনীতি
পৃষ্ঠা ৮

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ও কমরেড শিবদাস ঘোষের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৫ আগস্ট প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বিকাল ৫টায় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, কমরেড ফ্রেডরিক এঙ্গেলস বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে এ যুগের সত্য মতাদর্শ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মূলনীতিগুলো তুলে ধরার ক্ষেত্রে কার্ল মার্কসের সহযোগী হিসেবে অনন্য অবদান রেখে গেছেন। বিরাট পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ সংগ্রামী কমিউনিস্ট চরিত্রের অধিকারী কমরেড এঙ্গেলস্ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে জগত-জীবন, সমাজ ও অর্থনীতির বিকাশের গতির সূত্র ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন তা আজও মার্কসবাদের জ্ঞানভান্ডারে *(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বর্তমান পরিস্থিতি, পরিবর্তনের সংগ্রাম ও বিকল্প শক্তি কোন্ পথে

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা নিয়ে অসন্তুষ্টি ও ভবিষ্যত নিয়ে হতাশা অধিকাংশ মানুষের মনেই আছে। জনগণ এই অবস্থার পরিবর্তন চায়, কিন্তু পরিবর্তনের ক্ষমতা নিজের হাতে আছে বলে মনে করে না। কারণ, পরিবর্তন বলতে মানুষ বোঝে ভোটে সরকার পাল্টানো। কিন্তু, জনগণের ভোট ছাড়াই দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা ধরে রেখেছে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার। ভবিষ্যতেও ক্ষমতা দখলে রাখতে তারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে বলে জনমনে ধারণা। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগের পরিবর্তে ক্ষমতায় আসার মতো প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তি আছে বিএনপি। তারাও তো অতীতে প্রায় একই ধরনের দুঃশাসন চালিয়েছে। ফলে, পরিবর্তন কোন্ পথে সম্ভব – এ প্রশ্নের জবাব না পেয়ে মানুষ উপায়হীন-অসহায় মনোভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু, আন্দোলনের পথ ও উপায় খুঁজে পেলে মানুষ নিশ্চয় এগিয়ে আসবে। সঠিক পথে ও নেতৃত্বে সংগঠিত জনগণের সচেতন সক্রিয় ভূমিকাই এই অচলায়তন ভাঙ্গতে পারে।

বর্তমান অবস্থা গত ৪৬ বছরের পুঁজিবাদী দুঃশাসনের ফলাফল

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি পালাক্রমে ক্ষমতায় ছিল গত ৪৬ বছরে। ফলাফল – গণতন্ত্র মৃত্যুশয্যায়, অভাব-বেকারত্ব-মূল্যবৃদ্ধিতে জনজীবন বিপর্যস্ত, লুটপাট-দুর্নীতি সর্বগ্রাসী, সন্ত্রাস-দখলদারিত্ব-দলীয়করণের বিস্তৃতি, সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদের উত্থান, সামাজিক মানবিক নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। বর্তমান মহাজোট সরকার নিজেদের যাবতীয় অপকর্ম ঢাকতে বিরামহীনভাবে 'উন্নয়ন'-এর ঢাক পিটিয়ে চলেছে। প্রশ্ন হলো, এত উন্নয়নের পরেও কেন হাজার হাজার বাংলাদেশী বিপজ্জনক সাগরপথে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে যাচ্ছে ইউরোপে বা মালয়েশিয়ায়? বাংলাদেশে তো কোনো যুদ্ধ পরিস্থিতি নেই। ঈদের সময় সামান্য দামের জাকাতের শাড়ি নিতে গিয়ে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে মারা যায় দরিদ্র নারীরা। হাওর, পাহাড়, সমতলে বন্যা-বৃষ্টিতে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে কেন? কেন এখনো সরকারি হিসাবেই ৪-৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে? গ্রামে গ্রামে লক্ষ-কোটি মানুষ ক্ষুদ্রঋণের ফাঁসে জড়ায় কেন? বস্তিবাসী-গৃহহীন-ভিক্ষুকের সংখ্যা কত? শিক্ষা-চিকিৎসার অধিকার কি সবার আছে? শ্রমিকরা কি ৮ ঘন্টা কাজের মজুরিতে মোটামুটি সংসার চালাতে পারে? কৃষক কি ফসলের ন্যায্য দাম পায়? এমন আরো অনেক প্রশ্ন সরকারের কথিত উন্নয়নকে প্রতিনিয়ত ব্যঙ্গ করে।

আসলে রাস্তাঘাট-ফ্লাইওভার-দালানকোঠা অনেক কিছু হয়েছে। কিন্তু মূল সমস্যা শোষণ-বৈষম্য-অভাব-বেকারত্ব রয়ে গেছে। আরেকদিকে সমাজের একাংশের প্রচুর উন্নতি হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে বছরে ৭৫ হাজার কোটি টাকার বেশি পাচার হচ্ছে বিদেশে। সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশীদের জমানো টাকার পরিমাণ বাড়ছে। মালয়েশিয়ার সেকেণ্ড হোম বা কানাডার 'বেগমপাড়া'য় বাংলাদেশীদের সংখ্যা বাড়ছে। কোথা থেকে আসে এত টাকা? বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ ৭৩ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা। আদায় অযোগ্য হয়ে যাওয়ায় অবলোপন করা হয়েছে প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকার খেলাপি ঋণ। সবমিলে খেলাপি ঋণের মোট স্থিতি ১ লাখ ১৮ হাজার কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ১৭ শতাংশ। কালো টাকা সীমাহীন, অর্থমন্ত্রী একবার বলেছিলেন জিডিপি'র ৮০%-ই কালো টাকা। সরকারী ব্যাংকের হাজার হাজার কোটি টাকা জালিয়াতি করে আত্মসাৎ করা হচ্ছে। সোনালী ব্যাংক থেকে হলমার্ক কেলেঙ্কারিতে ৪ হাজার কোটি টাকা লুট, বেসিক ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান নিজের প্রভাব খাটিয়ে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা ভুয়া ঋণ প্রদান, বিসমিল্লাহ গ্রুপ-এর নামে ৫ ব্যাংক থেকে ১২০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ এর উদাহরণ। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে 'ডিজিটাল পদ্ধতিতে' ৮০০ কোটি টাকারও বেশি চুরির ঘটনা ঘটেছে। ২০১০ সালে শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারিতে সরকারি তদন্ত কমিটির হিসেবেই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অন্তত ১৫ হাজার কোটি টাকা লুট করা হয়েছে। মাল্টিলেভেল মার্কেটিংয়ের নামে লোক ঠকিয়ে টাকা কামাচ্ছে একদল, *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়, জনজীবনের সংকট সমাধান ও বিকল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে

বামপন্থীদের যুক্ত আন্দোলনের ঘোষণা

৩০ জুলাই ঢাকার রাজপথে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ও সিপিবি-বাসদ এর যৌথ মিছিল

গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়, দুর্নীতি-লুটপাট-দখলদারিত্ব বন্ধ, জনজীবনের সংকট সমাধান ও মহাজোট-জোট এর বাইরে বাম-গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ে তুলতে প্রস্তাব ও আশু দাবিসমূহ তুলে ধরে যুগপৎ আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ। ১ আগস্ট ঢাকার কমরেড মণি সিংহ সড়কস্থ মৈত্রী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে বামপন্থীদের আশু দাবিসমূহ ঘোষণা করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী)-এর কেন্দ্রীয় নেতা শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, সিপিবি'র সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণসংহতি আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, মহাজোট সরকারের দুর্নীতি আর দুঃশাসনে মানুষ আজ দিশেহারা। সংবিধানস্বীকৃত গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ এখনও রুদ্ধ, ভোটাধিকারও কেড়ে নেয়া হয়েছে। নিপীড়ন, হয়রানিমূলক মামলা, অপহরণ, গুম-খুন, *(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গণবিরোধী দুঃশাসন প্রতিরোধে বাম-গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তুলুন

(১ম পৃষ্ঠার পর) শুধু ডেসটিনি-ই আত্মসাৎ করেছে ৪,১১৯ কোটি টাকা। ক্ষুদ্রঋণের ব্যবসা করে ফুলেফেঁপে উঠছে এনজিওগুলো। গার্মেন্টস শ্রমিকদের নামমাত্র মজুরি দিয়ে সর্বোচ্চ রপ্তানি আয় (বছরে প্রায় ৩০০০ কোটি ডলার বা ২ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা) করে টাকার পাহাড় বানাচ্ছে মালিকরা। বাংলাদেশে নিম্নতম মজুরি ৫৩০০ টাকা মাত্র যা এশিয়ার মধ্যেই সর্বনিম্ন। শ্রমিক রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, দমন-পীড়ন চালিয়ে মালিকদের ইচ্ছামত শর্তে ও কর্মপরিবেশে শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সরকারের কাছে বেশি দামে বিদ্যুৎ বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা নিচ্ছে রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টের মালিকরা, বছরে অন্তত ৬-৭ হাজার কোটি টাকা এই বাবদ লোকসান হচ্ছে বিদ্যুতখাতে। দেশের বড় গ্যাসক্ষেত্রগুলো শুষে নিয়ে বিপুল মুনাফা করছে বিদেশি কোম্পানি, তার ভাগ পাচ্ছে এদেশের কিছু লোক। অযৌক্তিকভাবে ওষুধের দাম, গাড়িভাড়া বাড়িয়ে, কখনো চিনি-ভোজ্য তেল, কখনো ডাল-পিঁয়াজ ইত্যাদির কৃত্রিম সংকট তৈরি করে মানুষের পকেট কাটছে ব্যবসায়ীরা। শিক্ষা ও চিকিৎসা এখন লাভজনক ব্যবসাক্ষেত্র। কৃষকের কাছ থেকে মৌসুমে কম দামে ধান কিনে নিয়ে মজুদ করে হাওরে বন্যা ও নেকব্লাস্ট রোগে ফসলহানির সুযোগে এখন চড়া দামে চাল বিক্রি করে মুনাফা করছে চাল ব্যবসায়ী-আড়তদার-মিল মালিক সিন্ডিকেট।

অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের ওপর কর-ভ্যাটের বোঝা ক্রমাগত বাড়িয়ে সরকার বড় বাজেট করছে, বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প নিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, মহাসড়ক-রেললাইন-ফ্লাইওভার-সেতুসহ যেকোনো নির্মাণ কাজে উন্নত দেশগুলো থেকে অনেক বেশি খরচ হচ্ছে বাংলাদেশে। যেমন, উন্নত দেশগুলোতে প্রতি কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণে গড় ব্যয় হচ্ছে ৩১ কোটি টাকা। অথচ, বাংলাদেশে সর্বশেষ ঢাকা-পায়রা বন্দর রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পে প্রতি কিলোমিটারে ব্যয় ধরা হয়েছে ২৫০ কোটি টাকা। ভারত, চীন, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কার মতো দেশগুলোর চেয়ে বাংলাদেশে দ্বিগুণ বা তারও বেশি ব্যয়ে ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে কয়েকবছর ধরে সর্বনিম্ন দামে তেল কিনে দেশে দ্বিগুণেরও বেশি দামে বিক্রি করে সরকার রাজস্ব বাড়াচ্ছে। গ্যাস খাতে কোনো লোকসান না থাকলেও দাম বাড়িয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগার ভরা হচ্ছে। বিদ্যুতের দাম দফায় দফায় বাড়িয়ে সরকারঘনিষ্ঠ বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের মুনাফা যোগান দেয়া হচ্ছে। এইভাবে শোষণ-লুণ্ঠন-দুর্নীতি সবকিছুর মিলিত ফলাফলে শিল্পপতি-ব্যবসায়ী-সামরিক/বেসামরিক আমলা-এনজিও মালিক-মধ্যসত্ত্বভোগী এরা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে। এই শোষক-লুটেরাদের তত্ত্বাবধায়ক ও সুবিধাভোগী হলো ক্ষমতাসীন দলের নেতারা। ক্ষমতাপ্রত্যাশী বিরোধী দলের লোকেরাও এসব ধনকুবেরদের সাথে যোগাযোগ রাখেন, তারাও এদের হাতে রাখেন।

ফলে দেশের চিত্র হলো – উন্নয়ন হচ্ছে মুষ্টিমেয় ধনীদের, তাদের সম্পদ হু-হু করে বাড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে শুধু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে এক কোটি টাকার বেশি আমানত রয়েছে এমন হিসাবের সংখ্যা ৪৯ হাজার ৫৫৪। ২০০৯ সালে কোটিপতি ছিল ২৩ হাজার ১৩০ জন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ ওয়েলফেয়ার মনিটরিং সার্ভে অনুযায়ী, মাত্র ৪ দশমিক ২ শতাংশের হাতেই দেশের সম্পদের সবচেয়ে বড় অংশ, ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ। এর কিছুটা ভাগ পাচ্ছে মধ্যবিত্তদের ওপরের অংশ। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক-চাষী-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ কোনোমতে টিকে আছে। বাস্তবে, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এমনই হবার কথা। সব পুঁজিবাদী দেশেই, এমনকি উন্নত দেশগুলোতেও প্রাচুর্য আর দারিদ্র্যের সহাবস্থান অবশ্যম্ভাবী। এর কারণ হলো, সমাজে সবাই শ্রম দিয়ে যে সম্পদ তৈরি করে তার সিংহভাগ জমি-কারখানা-ব্যবসা ইত্যাদি উৎপাদনযন্ত্রের মালিকানার জোরে পুঁজিপতি শ্রেণীর পকেটে চলে যায়। সামান্য অংশ শ্রমিক ও পেশাজীবীরা পায়। এজন্যই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী।

ফ্যাসিবাদের পথে হাঁটছে দেশ

পুঁজিবাদী অর্থনীতি সৃষ্ট এই 'স্বাভাবিক' শোষণ-বৈষম্যের সাথে যুক্ত হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের বেপরোয়া লুটপাট-দুর্নীতি-দখলবাজি। এই লুণ্ঠনের স্বর্গরাজ্য টিকিয়ে রাখতে চলছে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, দমন-নিপীড়ন, সাম্প্রদায়িকতার সাথে আপোষ, ভারত তোষণসহ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোকে খুশি রাখার নীতি, প্রশাসন ও বিচারবিভাগের চূড়ান্ত দলীয়করণ ইত্যাদি। এদিকে, লুটপাট ও দখলের ভাগ নিয়ে হানাহানি চলছে সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যেই। এদের দাপটে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণ সন্ত্রস্ত। সম্প্রতি বগুড়ায় শ্রমিক লীগ নেতা কর্তৃক ধর্ষণ ও মা-মেয়েকে নির্যাতনের ঘটনা এর সর্বশেষ উদাহরণ। দুয়েকদিন পর হয়তো এটিও সর্বশেষ থাকবে না। বিরোধী রাজনীতি দমনে পুলিশ-র‍্যাব ও প্রশাসনের অপব্যবহারের ফলে আইনের শাসন ও শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে। নারায়ণগঞ্জে র‍্যাব কর্তৃক সাত খুন, ক্রসফায়ার-গুমের অসংখ্য ঘটনা, শেখ মুজিবের ছবি বিকৃতির কথিত অভিযোগে ইউএনওকে জামিন না দেয়া – এমন বহু ঘটনা উল্লেখ করা যাবে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও পার্লামেন্ট-বিচার বিভাগ-প্রশাসন এদের আপেক্ষিক স্বাধীনতা কিছুটা থাকে। বর্তমান সরকার সব প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্ষমতার চূড়ান্ত কেন্দ্রীভবন করে এক ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করার পথে হাঁটছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও উন্নয়নের শ্লোগান দিয়ে সব অপকর্মকে জায়েজ করার চেষ্টা হচ্ছে।

জনদাবিতে লড়াই-সংগ্রাম ছাড়া কেবল নির্বাচনমুখী হয়ে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সম্ভব নয়

জনগণ এই স্বৈরতান্ত্রিক ও গণবিরোধী শাসনের পরিবর্তন চায়। কিন্তু ভোটে পরিবর্তনের আশা দেখা যাচ্ছে না, কারণ এই সরকার নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করেছে। অন্যদিকে, শাসক শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ বিরোধে বা পুঁজিপতি শ্রেণীর গড় শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করতে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের পথে সরকার পরিবর্তন হলে তাতেও জনস্বার্থ রক্ষা হবে না। ২০০৭ সালের ১/১১ এর ঘটনা সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। বিকল্প হলো - গণঅভ্যুত্থানের পথে সরকার পরিবর্তন অথবা গণআন্দোলনের চাপে আপাত নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধ্য করা। কিন্তু নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন হলেই কি সমস্যার সমাধান হবে? আওয়ামী লীগও তো নির্বাচিত সরকার ছিল। এর আগে নির্বাচনে জেতা বিএনপি সরকার ২০০৬ সালে নীলনকশার নির্বাচন আয়োজন করে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিল। বাস্তবে আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জাতীয় পার্টি-জামায়াত এসব দলগুলি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। এসব বুর্জোয়া দলগুলি আজ আর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চেতনাও ধারণ করে না। ফলে শুধু নির্বাচনে সরকার বদল নয়, আন্দোলনের লক্ষ্য হতে হবে ব্যবস্থার বদল। কিন্তু বাস্তবতা হল – এই মুহূর্তে সমগ্র আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বদলানোর উপযুক্ত রাজনৈতিক শক্তি গড়ে ওঠেনি। ফলে, আশু লক্ষ্য হতে পারে – জনগণের দাবি আদায়ে আন্দোলনের সংস্থা গড়ে তোলা। এই সংস্থার নেতৃত্বে জনজীবনের সংকট নিরসন ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে লাগাতার আন্দোলনের পথে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গণভিত্তি অর্জন করতে পারে ও ভবিষ্যতে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিতে পারে।

যেন-তেন প্রকারে দ্রুত কিছু করার মনোভাব সুবিধাবাদের জন্ম দেয়

বামপন্থীরাই একমাত্র রাজনৈতিক শক্তি যারা বিদ্যমান ব্যবস্থা বদলের কথা বলে ও যাদের পক্ষে সম্ভব বিকল্প কর্মসূচি দেয়া। সাংগঠনিক শক্তিতে ক্ষুদ্র হলেও যেকোনো সরকারের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড ও জনবিরোধী পদক্ষেপ-এর বিরুদ্ধে তারাই সাধ্যমতো প্রতিবাদ ও আন্দোলনে নেমেছে। গ্যাস-বিদ্যুৎ-নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি, কৃষিতে ভর্তুকি ও ফসলের ন্যায্য দামের দাবিতে, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রতিবাদে, হাওরের দুর্গত মানুষকে রক্ষার দাবিতে, সাম্প্রদায়িক-জাতিগত-লিঙ্গগত নিপীড়নের প্রতিবাদে, গুম-খুন-ক্রসফায়ারের বিরুদ্ধে, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষাসহ নানা দাবিতে বামপন্থী দলগুলো সবসময়ই কম-বেশি রাস্তায় আছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ নিয়ে বামপন্থী শক্তিসমূহ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কার্যকর গণভিত্তি সম্পন্ন কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। কতক বামপন্থী দল 'বিকল্প' -এর কথা বললেও প্রধান দুই বুর্জোয়া দলের মধ্যকার বিরোধে দুতিয়ালি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় অথবা 'মুক্তিযুদ্ধের' পক্ষের শক্তি/চেতনার ধুয়া তুলে আওয়ামী ব্ল্যাকমেইলিং-এর শিকারে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষের কাছে এই সব বামপন্থী দলসমূহ আওয়ামী ঘরানার রাজনৈতিক শক্তি হিসেবেই বিবেচিত হয়। এ সব কারণে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তুলতে একটা কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বামপন্থী দলসমূহ জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। জনসাধারণের কাছে ব্যাপকভাবে যেতে না পারা, আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে না পারায় গণসম্পৃক্তি খুব বেশি অর্জন করা যায়নি। বুর্জোয়ারা টাকা-প্রশাসন-প্রচারমাধ্যম-পেশীশক্তি-ধর্ম-আঞ্চলিকতা ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে রাজনীতিকে নীতিহীন সুবিধাবাদী কর্মকাণ্ডে পরিণত করেছে। এর মধ্যে নীতি-আদর্শের রাজনীতি দাঁড় করানো সহজ নয়। এই প্রতিকূল অবস্থায় বামপন্থী রাজনীতিতেও হতাশাজাত অস্থিরতা তৈরি হয়, যেকোনোভাবে দ্রুত কিছু করে ফেলার মনোভাব জন্ম নেয়। এই পথে বিভ্রান্তি বা সুবিধাবাদ আসে।

যেমন, বামপন্থীদের অনেকে আওয়ামী লীগ-বিএনপি দ্বিদলীয় মেরুকরণের বাইরে বিকল্প শক্তি বা তৃতীয় ধারা গড়ার কথা বলে আ স ম রব, মাহমুদুর রহমান মান্না, বদরুদ্দোজা চৌধুরী, কাদের সিদ্দিকীদের সাথেও নির্বাচনী জোট বা সমঝোতা করতে চান। সম্প্রতি উত্তরায় আ স ম রবের বাসায় একটি সভায় পুলিশী হস্তক্ষেপ নিন্দিত হলেও, এর মধ্য দিয়ে এধরনের রাজনৈতিক মেরুকরণের উদ্যোগ দৃশ্যমান হয়েছে। যদিও প্রক্রিয়াটি কয়েক বছর ধরেই চলে আসছে। সাবেক রাষ্ট্রপতি বি চৌধুরির বাসায় জাতীয় পার্টির জি এম কাদেরসহ অনুরুপ আরেকটি সভার খবর পত্রিকায় এসেছে গত ২ আগস্ট। শাসক দলগুলো থেকে দলছুট বা তাদের একসময়ের সহযোগী কিছু নেতার ব্যক্তিপ্রচার এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এসব তথাকথিত 'উদার গণতন্ত্রী' দলগুলোর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কোনো কর্মসূচি নেই, জনগণের দাবিতে লড়াই-সংগ্রামের কোনো উদ্যোগ-ঐতিহ্যও নেই। এদের অনেকের ভাবমূর্তি বিতর্কিত, কেউ সামরিকতন্ত্রের সহযোগী ছিলেন, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের রাজনীতির সাথে যুক্ত বলে কারো কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। আওয়ামী লীগ-বিএনপি জোটের বাইরে বিকল্প রাজনীতির যে আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে আছে বা শাসকশ্রেণীরও বিশেষ সময়ে প্রয়োজন হতে পারে, তাকে ব্যবহার করে এরা সামনে আসতে চায়। প্রয়োজনে আবার প্রধান দুই জোটের সাথে যোগাযোগ ও দরকষাকষি করে সুবিধা নিতে চায়। বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমও তাদের কিছুটা প্রচার দিয়ে মানুষের সামনে বিকল্প হিসেবে খাড়া করে রাখে। এইসব তথাকথিত 'উদার গণতন্ত্রী'দের লক্ষ্য আসন্ন নির্বাচনে নিজের বা দলের জন্য দুয়েকটি সংসদীয় আসন নিশ্চিত করা। কিন্তু স্বভাবিক প্রক্রিয়ায় ভোটে জেতার মতো সাংগঠনিক শক্তি ও জনভিত্তি এদের প্রায় কারোই নেই। এজন্য শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের সাথে তাদের আঁতাত ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ নেই। যেসব বাম রাজনৈতিক দল এদের সাথে নিয়ে বিকল্প গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন, তাদের ভাবনা কী এ বিষয়ে? এই তৎপরতার মাধ্যমে তারা কার্যত বামপন্থার অবশিষ্ট গ্রহণযোগ্যতাকেও প্রশ্নের মুখে ফেলে দিচ্ছেন। এদের মধ্যে ড. কামাল হোসেনের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি জনমনে কিছুটা থাকলেও তিনি যে আন্দোলনের লোক নন তা পরিষ্কার। ফলে এদের সাথে নির্বাচনী ঐক্যে গণআন্দোলনের সম্ভাবনার দিক থেকে ফলপ্রসূ কিছু হবে না, বরং বামপন্থীদের জন্য তা আত্মঘাতী হবে।

বামপন্থীরা ছাড়া এ মুহূর্তে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর মতো শক্তি নেই

জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অংশ হিসেবে ভোটাধিকার রক্ষায় আপাত নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি বামপন্থীরা অবশ্যই জোরের সঙ্গে তুলবে। কিন্তু, নির্বাচনটাই তাদের প্রধান লক্ষ্য হতে পারে না। জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হলে তাতে বামপন্থীদের অংশগ্রহণের লক্ষ্য হওয়া দরকার আন্দোলনের শক্তি ও বক্তব্যকে মানুষের কাছে আরো ছড়িয়ে দেয়া। বুর্জোয়াদের সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক-কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠীর সমর্থন-টাকার জোর-মিডিয়া-পেশীশক্তিকে মোকাবেলা করার মতো মজবুত সংগঠন এবং লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে প্রভাব তৈরি করা ছাড়া নির্বাচনে এই মুহূর্তে 'কিছু করে ফেলা'র চিন্তা বাস্তবসম্মত বলে মনে হয় না। বাম ও 'উদারপন্থী'রা মিলিতভাবে নির্বাচন করলেও প্রচার যতই পাক্, সংগঠন ছাড়া ভোটের মাঠে তা বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারবে না। অবশ্য, আওয়ামী লীগ বা বিএনপি জোটের সাথে দর কষাকষি করে কেউ কোনো ছাড় পেলে তা ভিন্ন কথা। গণআন্দোলনের ধারায় অন্য কোনো গণতান্ত্রিক শক্তি যদি অংশগ্রহণ করে এবং জনগণের মধ্যে যদি ঐক্যের তাগিদ সৃষ্টি হয়, তখন বামপন্থীদের সাথে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোরও যুগপৎ বা অভিন্ন লক্ষ্যে আন্দোলন হতে পারে। এখন পর্যন্ত বাস্তবতা হচ্ছে, বামপন্থীরা ছাড়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আমরা এসব দিক গভীরভাবে ভেবে দেখার জন্য সকল বাম নেতা-কর্মী-সমর্থক ও সচেতন দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানাই।

এই অবস্থায় গত ৩০ জুলাই যৌথ সমাবেশ ও ১ আগস্ট সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ও সিপিবি-বাসদ যুগপৎ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে। গণতন্ত্র রক্ষা, জনজীবনের সংকট নিরসন ও বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প শক্তি গড়ে তোলার ডাক দিয়ে আশু ২১ দফা দাবিতে যুক্ত আন্দোলনের ঘোষণা বামপন্থী নেতা-কর্মী-সমর্থক ও সচেতন মানুষের মধ্যে আশাবাদ সঞ্চার করেছে। ঐক্যবদ্ধভাবে ধারাবাহিক সংগ্রামের মাধ্যমে বামপন্থীরা জনগণের আস্থা অর্জন করবে এবং এই পথে অন্যান্য বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি-ব্যক্তিবর্গকে সমবেত করে সত্যিকার অর্থে জনগণের পক্ষের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেবে – আমরা এই প্রত্যাশাই করি।

ব্রিটিশ শিক্ষকের দৃষ্টিতে নভেম্বর বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়া

(নভেম্বর বিপ্লব জারশাসিত রাশিয়ার অত্যাচারিত মানুষকে কীভাবে মুক্তির সন্ধান দিয়েছিল, রুশ দেশে শিক্ষকতা করার সুবাদে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তা তুলে ধরেছেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির গ্র্যাজুয়েট ও ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক প্যাট স্লোন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে তিন দফায় রাশিয়ায় গিয়ে তিনি থেকেছেন। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচার করা নানা ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে ১৯৩৮ সালে তিনি 'রাশিয়া উইদাউট ইল্যুশন' বইটি লেখেন। ১৯৪৫ সালে সেটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'বিপ্লবোত্তর রাশিয়া' নামে। ব্রিটিশ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের তুলনায় সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এই বইতে প্যাট স্লোন দেখিয়েছেন, এবং সমাজতন্ত্রের অধীনে রুশ জনগণের সর্বাঙ্গীন অগ্রগতির বিবরণ তিনি দিয়েছেন। এই লেখাটির অল্প কিছু নির্বাচিত অংশ পুনর্মুদ্রিত হয় ভারতের সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইণ্ডিয়া(কমিউনিস্ট),সংক্ষেপে এসইউসিআই(সি) দলের বাংলা মুখপত্র সাপ্তাহিক গণদাবী-র গত ২০ ও ২৭ জানুয়ারি, ২০১৭ সংখ্যায়। কমিউনিজম ও স্ট্যালিন বিরোধী মিথ্যা প্রচারের মুখোশ খুলতে রচনাংশটি গুরুত্বপূর্ণ, এই বিবেচনায় নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষে ধারাবাহিক প্রকাশনার অংশ হিসেবে এখানে ছাপানো হল।)

সোভিয়েট স্বাধীনতার মূল কথা

১৯৩৫ সালে রয় হাওয়ার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে স্ট্যালিন নানা কথার মধ্যে স্বাধীনতা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছিলেনঃ

"একজন অভুক্ত চাকরিহীন বেকার যে কী ধরনের ব্যক্তি স্বাধীনতা উপভোগ করার আশা করে তা আমি ভেবে পাই না। শোষণ যেখানে লোপ পেয়েছে, যেখানে একের উপর অন্যের পীড়নের প্রশ্ন নেই, যেখানে নেই দারিদ্র ও বেকারত্বের প্রশ্ন, যেখানে কোনও লোক আগামীকাল রুটি, ঘর বা কাজ হারাবার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত নয়, সেখানেই প্রকৃত স্বাধীনতা হতে পারে। শুধু সে সমাজেই প্রকৃত ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্ভব।"

উপরোক্ত কথাগুলিই হচ্ছে সোভিয়েট স্বাধীনতার মূল কথা। .....সমস্ত মজুর শ্রেণির কারখানা পরিচালনার দাবি ও কৃষকের জমির স্বত্ব দাবির ফলেই এই সোভিয়েট রাষ্ট্রের পত্তন সম্ভব হয়েছে। এবং এই নতুন পদ্ধতির আওতায় কারখানা পরিচালনায় শ্রমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে ও গ্রাম্য শাসনব্যবস্থায় কৃষকদের প্রত্যক্ষ অংশ নেওয়ার ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণি দেখতে পাচ্ছে যে তাদের স্বাধীনতার দাবির মধ্য দিয়ে তারা এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থার সৃষ্টি করতে পেরেছে যাতে কি অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, কি শিক্ষা ও মানসিক উন্নতির ক্ষেত্রে তারা স্বপ্নাতীত সুখ বা আনন্দের অধিকারী হতে পেরেছে। .....

রাশিয়ার পূর্বতন শাসনকর্তাদের কাছে এই অভিনব সামাজিক পদ্ধতি একেবারেই অবাঞ্ছনীয় ছিল। .....

সোভিয়েট ইউনিয়নে দেখেছি যে অর্থনীতি, ইতিহাস ও দর্শন প্রভৃতি বিষয়কে বিজ্ঞান হিসাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে । উদ্দেশ্য হল ছাত্রদের চিন্তার খোরাক জোগানো এবং বিরুদ্ধ মতামতের এলোমেলো চিন্তা থেকে রেহাই দেওয়া। কারণ এসব তত্ত্ব পুঁজিবাদকে মূল ভিত্তি বলে ধরে নিয়েছে। এছাড়া ছাত্রদের কাছে অর্থনীতি ও মানব ইতিহাসের চিন্তাধারা মূল চিত্রকে প্রকটিত করে। মানুষের ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বোধের সৃষ্টি করাও হল এর অন্যতম লক্ষ্য। কেমব্রিজে অর্থনীতিতে হাত পাকিয়ে ও উত্তর ওয়েলসে দু'বছর ধরে সে সব শিক্ষা দিয়ে আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, মস্কোয় প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্ব-সমস্যাকে বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি করার উপযোগী পাঠ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। সেখানে আরও দেখতে পাই যে, যে সব বই অবলম্বন করে এই উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, আমাদের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় সেগুলোর কোনও উল্লেখ নেই।.....

ব্রিটেনে একজন মার্কসপন্থীর অর্থনীতির অধ্যাপক হওয়ার মতোই মস্কোয় একজন মার্কসবিরোধীর অর্থনীতির অধ্যাপক হওয়া একটা কঠিন ব্যাপার। তেমন জার্মানি ও ভারতবর্ষে দুটি পদ্ধতিই পাশাপাশি নিজস্ব নীতি বজায় রেখে কাজ করছে, এটাও একটা অভাবনীয় ব্যাপার। যদি আমরা সোভিয়েটের অর্থনীতিকে বৈজ্ঞানিক ও আমাদেরটা অবৈজ্ঞানিক বলে মেনে নিই, তবে স্বীকার করতে হবে যে সোভিয়েটে অর্থনীতি বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরিচালিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ পায়। সে জায়গায় এদেশের মানসিক চিন্তাবৃত্তিগুলো অবৈজ্ঞানিক সুড়ঙ্গ পথে হাঁপিয়ে মরে। সত্যকে খুঁজে নেওয়ার স্বাধীনতা ইংল্যান্ড থেকে সোভিয়েটে ঢের বেশি।.....

কাজেই এটা স্বাধীনতা বনাম স্বাধীনতা দমনের প্রশ্ন নয়। এ হচ্ছে বিভিন্ন রকমের স্বাধীনতার মধ্যে থেকে একরকম স্বাধীনতা বেছে নেওয়ার প্রশ্ন। আমার মতোই যদি আপনারা মার্শেলের ও মার্কসের অর্থনীতির আপেক্ষিক তুলনায় সক্ষম হয়ে থাকেন এবং এই ধারণায় এসে থাকেন যে মার্কসের অর্থনীতিই হচ্ছে একমাত্র বৈজ্ঞানিক এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর যুগ থেকে ভুল বা অবৈজ্ঞানিক পথে পাক খেয়ে নিজের চারপাশে একটা পৌরাণিক কাহিনী সৃষ্টি করেছে – তবে নিজেদের শিক্ষাপদ্ধতিকে নিন্দা ও সোভিয়েট শিক্ষাপদ্ধতিকে প্রশংসা করতে বাধ্য হবেন। আবার কেউ যদি মনে করে যে আমাদের অর্থনীতিবিদদের মতামতসমূহ বৈজ্ঞানিক, মার্কসবাদীর মতামত অবৈজ্ঞানিক, তবে এখানকার পদ্ধতিই আপনি পছন্দ করবেন। কিন্তু যে যাই ভাবুন, কেউ যেন কল্পনাও না করেন যে কোনও মার্কসপন্থীর অবাধে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির সর্বোচ্চ পদ অধিকার করার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। সেটা সোভিয়েটেও নেই। কারণ আজ পর্যন্ত এরূপ স্বাধীনতা কোথাও দেখা যায়নি। .....

মার্কসীয় চিন্তাধারাই একমাত্র খাঁটি বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, এই মত প্রসারের ফলে যদি জনমতের চাপে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান প্রশ্নে তাদের মতামত বদলাতে বাধ্য হয় এবং উচ্চপদে মার্কসপন্থীরা উন্নীত হয় তাহলে মার্কসবিরোধীদের সরিয়ে সে জায়গায় মার্কসপন্থীদের নিয়োগ করলে সোভিয়েটের মতো এখানেও একই ধরনের অভিযোগ চলতে থাকবে। তারা তখন স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত বলেই অভিযোগ করতে থাকবে। আমি সোভিয়েটে একবার ইতিহাসের ক্লাসে উপস্থিত ছিলাম। তাকে আমি এক কথায় বলতে পারি অপূর্ব। অথচ সেই ক্লাসের বক্তা একজন খেতাবধারী অধ্যাপক নন একজন সাধারণ শিক্ষক মাত্র। তাঁর বলার কৃতিত্ব তাঁর ব্যক্তিত্বের ফলে নয়, সেটা হচ্ছে মানুষের চিন্তাধারার ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির গুণ। কৃতিত্বপূর্ণ উপায়ে মানুষের চিন্তাধারার ইতিহাস প্রকাশের স্বাধীনতা উপভোগকারী সোভিয়েট যুবকদের আমি ঈর্ষা করি। আমাদের ছাত্রেরা এই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। কারণ মার্কসীয় অর্থনীতিবিদদের মতো মার্কসীয় দার্শনিকেরাও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অপাংক্তেয়। ইতিহাসের বেলায়ও এটা পুরোপুরি প্রযোজ্য।.....

সময়ে সময়ে আমাকে লেখকরা জিজ্ঞাসা করেন যে "ধরুন, আমি যদি আজ সোভিয়েটে বাস করে কোনও বই লিখি এবং যে কোনও কারণে হোক সেটা যদি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পায় তবে আমি সেটা প্রকাশ করতে পারব কি?" স্পষ্টই উত্তর দিয়ে থাকি – "না"। কারণ আজকে সোভিয়েট রাশিয়ায় বই প্রকাশের দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের, ট্রেড ইউনিয়নের, কমিউনিস্ট পার্টির ও অন্যান্য গণপ্রতিষ্ঠানের। সোভিয়েট জাতি গড়ে তোলার জন্য এসব সংঘ সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যেহেতু এসব প্রকাশনালয় হচ্ছে গণপ্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত নয়, কাজেই তারা ব্যক্তিগত মুনাফার খাতিরে নয় জনস্বার্থের ভিত্তিতেই এসব বইয়ের বিচার করে, বিবেচনা করে। কাজেই তারা জনস্বার্থের উপযোগী বইই শুধু ছাপায়, অন্য বই নয়। শেক্সপিয়ার ও টলস্টয়ের বই হাজারে হাজারে ছাপানো হয়, তবে সস্তা দরের চটকদার বই আদৌ ছাপানো হয় না। সবাই স্বীকার করবে যে, এ হচ্ছে সোভিয়েট পদ্ধতির অন্যতম সুবিধা। এতে নিশ্চয়ই কেউ অমত করবে না। লেনিন ও স্ট্যালিনের লেখা বই লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। তাই বলে হিটলার বা ট্রটস্কির লেখা মোটেই ছাপানো হয় না। রাজনৈতিক মতবাদ অনুসারে এটা অনেকেই ভালো বা খারাপ বলবে। ...

ধনতন্ত্রের আওতায় প্রকাশনালয় চলে মুনাফার খাতিরে। প্রকাশকদের সেখানে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির চাইতে বই কাটতির দিকেই প্রবল ঝোঁক। ফলে সোভিয়েটের মতো সমাজসেবার প্রেরণা নিয়ে সেখানে প্রকাশনালয় পরিচালিত হয় না। কাজেই মুনাফালোভী প্রকাশকের কর্তৃত্ব, না জাতির সংস্কৃতির মান উন্নতকারী জনপ্রতিনিধিদের কতৃত্ব, এই দুটির একটিকে বেছে নিতে হবে। ...

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বা পুঁজিবাদের যখনই কোনও সংকট দেখা যায় তখনই এমনকী ব্যক্তিগত প্রকাশনালয়গুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে পড়ে। যদি আমরা ব্রিটেনেও কুৎসা প্রচার আইন, দেব নিন্দা আইন, সরকারি গুপ্ত আইন অথবা সরকারি অনুমতি ব্যতীত প্রকাশিতব্য নয় – এ ধরনের আইনের কথা ধরি তবে দেখতে পাওয়া যাবে যে, আমাদের স্বাধীনতার ক্ষেত্রও যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। জরুরি অবস্থায় স্বাধীনতার তো কোনও কথাই আসে না। যদি আমরা চল্লিশ কোটি লোকের দেশ ভারতবর্ষের কথা ধরি তবে দেখতে পাব, ব্রিটিশ আইনের দৌলতে বহু বামপন্থী প্রকাশনালয়ের বই ভারতবর্ষে পাঠানো নিষিদ্ধ। ব্রিটিশ স্বাধীনতা সমগ্রভাবেও সোভিয়েট স্বাধীনতার চেয়ে মোটেই প্রশস্ত নয়। শিক্ষা সংক্রান্ত স্বাধীনতার কথা যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি সে সম্বন্ধেও এই একই কথা খাটে। কে এই স্বাধীনতা নির্ধারণ করবে এবং কাদের স্বার্থের খাতিরে করবে? উভয় ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা রাষ্ট্রের বিশেষ উদ্দেশ্য অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃত স্বাধীনতাকামীর প্রশ্ন হবে, একটি পরাধীন দেশে বা যুদ্ধরত দেশে শেষ পর্যন্ত কোন্ ব্যবস্থা প্রত্যেক লোককে স্বাধীন নাগরিক হিসাবে উন্নত হবার বেশি সুযোগ দেবে - সমাজতন্ত্র না পুঁজিবাদ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর সোভিয়েটে বর্তমানে যে জরুরি অবস্থা, যুদ্ধাবস্থা চলছে এটাও আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে যার জন্য সোভিয়েটকে কতক ব্যবস্থা নিজের হাতে নিতে হয়েছে। ...

ধর্মের স্বাধীনতা

এদেশে একটা প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, সোভিয়েটে ধর্মের স্বাধীনতা নেই। কোনও সত্য নেই এ কথার পিছনে। অবশ্য এটা ঠিক যে অন্যান্য দেশের গির্জার তুলনায় রাশিয়ার গির্জাগুলো কিছুটা আর্থিক দুরবস্থা ভোগ করে। কারণ তারা এখন জমি বা মুলধনের মুনাফা ভোগ করতে পারে না। বর্তমানে বস্তির ভাড়া থেকে বঞ্চিত হলে ইংল্যান্ডের গির্জাগুলোও নিঃসন্দেহে দারুণ দুরবস্থায় পড়বে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বক্তব্য হল, কেন আমরা দলে দলে ছেলেমেয়েদের যথেচ্ছ ক্যাথলিক, ব্যাপটিস্ট বা গোঁড়া রাশিয়ান হতে দেব? আমরা ধর্ম সম্বন্ধে নিরীশ্বরবাদী। আমরা এদের কাউকে আমল দিই না। তাই পারিবারিক গণ্ডির বাইরে এসব ছেলেমেয়েকে ধর্মবুদ্ধি প্রণোদিত করা নিষিদ্ধ। এ সব ছেলেমেয়েরা কিছু টা প্রাপ্তবয়স্ক হলেই, তারা ইচ্ছা করলে গির্জায় যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু নিজেদের বিচার-বুদ্ধি পরিণত না হওয়া পর্যন্ত এদের মধ্যে ধর্মের আবেগ ঢুকিয়ে দেওয়ার আমাদের কী অধিকার আছে? ...

ধর্ম বিশ্বাস যদি স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা থেকে আসে তবে সোভিয়েটে তা জীবন্ত হয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ ধর্মপ্রাণ যুবক যুবতী ইচ্ছা করলে যে কোনও গির্জায় গিয়ে তাদের আধ্যাত্মিক আশার তৃপ্তিসাধন করতে পারে। কিন্তু এটা যদি নেহাৎই মানবিক ও সামাজিক বস্তু হয় এবং একটা বিশেষ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা পদ্ধতি অপরিণত ও অবচেতন যুব মনের উপর আধিপত্য করে বেতার ও পত্রিকা প্রচারের দ্বারা এটাকে জীবিত রাখতে চায়, তাহলে সোভিয়েট রাশিয়ায় এটার বাঁচবার কোনও আশাই নেই।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা

সোভিয়েট রাষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল। রাশিয়ায় যাবার আগেও আমি তা জানতাম। একদলীয় নায়কত্ব কী করে গণতান্ত্রিক হতে পারে এটা জানবার জন্য আমি অত্যন্ত উৎসুক ছিলাম। সোভিয়েটে থাকাকালে প্রথম বছরে অন্যান্য যে কোনও বিষয়ের চেয়ে একদলীয় পদ্ধতি সম্বন্ধেই আমি বেশি আলোচনা করেছি। আমি প্রশ্ন করতাম, "একটি মাত্র রাজনৈতিক দল নিয়ে কী করে আপনারা গণতন্ত্র রক্ষা করেত পারেন?" উত্তর পেতাম, "আমাদের একটা দলের চেয়ে বেশি দলের দরকার কী? আমাদের দল হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির দল আর আমাদের রাষ্ট্রও হচ্ছে শ্রমিক রাষ্ট্র। আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বিপর্যস্ত করার জন্য আমরা বহু পুঁজিবাদী দলের অস্তিত্ব কামনা করি না।" আমি বললাম, বেশ, মেনে নিলাম। "কিন্তু কর্মীদের মধ্যে মতানৈক্য হলে কী করেন? বিভিন্ন শ্রমিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন মত থাকতে পারে এবং সে সব মত প্রকাশের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন।" "আমাদের দলের ভেতরেই অনৈক্যের মীমাংসা সম্ভব। ওই সমস্ত বিষয়ের মীমাংসার জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রে কোনও ভিন্ন রাজনৈতিক দল সৃষ্টির প্রয়োজন হয় না।".... খুশি হলাম না।

সোভিয়েটে একদলীয় শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে এই যে একটা বিরাট গোলমেলে ধারণা, এটা হচ্ছে অনেকটা সেই দল সম্বন্ধে ভুল বোধের ফল। এটি আদৌ একটা পার্লামেন্টারি পার্টি নয়। আমি নিজেও আস্তে আস্তে দলের কার্যাবলি ও সাধারণের এর প্রতি আচরণ দেখে এটা বুঝতে পারি। ১৯৩৩ সালের হেমন্তকালে দল থেকে অবাঞ্ছিতদের সরিয়ে দেওয়ার সময়ে এর ভাল অভিব্যক্তি হয়েছে। আমি তখন ওখানে ছিলাম। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি হল 'শ্রমিক শ্রেণির সংঘবদ্ধ অগ্রবাহিনী', মানে সমগ্র শ্রমিক গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ যারা সমাজিক উন্নতির সাধারণ কর্মপন্থা পরিকল্পনার দায়িত্ব ও নেতৃত্ব নেওয়ার যোগ্য তাদেরই মিলিত সংঘ। কোনও প্রতিষ্ঠানই এই দাবি সঠিকভাবে পূরণ করতে পারে না, যদি না কাজের ভিতর দিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগ থাকে এবং তার কর্মীরা জনসাধারণের মতের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়। এই পদ্ধতির ফলে প্রত্যেক বছর দলের সকল সভ্য যে এলাকায় কাজ করে সেই এলাকার জনসাধারণের কাছে তাদের কাজের হিসাব নিকাশ দেয়, দেয় তাদের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং তাদের বর্তমান কাজের খতিয়ান এবং সব শেষে প্রমাণ করে শ্রমিক শ্রেণির 'সংঘবদ্ধ অগ্রবাহিনী'-র সভ্য হবার দাবির যৌক্তিকতা।

এ ধরনের সভায় জনসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকে। যে কেউ ইচ্ছা করলে সম্ভাব্য দলচ্যুত সভ্যের পক্ষে বা বিপক্ষে নানা রকম প্রশ্ন ছাড়াও কিছু আলোচনা করতে পারে। এরূপে কোনও কমিউনিস্ট কর্মী তার কাজের গুরুত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার কথা ঘোষণা করলেও আলোচনা এবং প্রশ্নের ভিতর দিয়ে তার দাবির অযৌক্তিকতা প্রমাণ হয়ে যাওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়। মানে তার কাজের ভিতর এমন গলদ থেকে যেতে পারে যেটা দলের সুনামের পক্ষে হানিকর বা পারিবারিক বা ব্যক্তিগত জীবনে তার আচরণ এত আপত্তিকর যে সে জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জনে অক্ষম। এ ধরনের *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ধর্ষক-নির্যাতকদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ

বগুড়ায় শ্রমিকলীগ নেতা ধর্ষক তুফান ও সহযোগীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে গত ১ আগস্ট জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে নারীমুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্তের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন আফসানা লুনা, সুস্মিতা রায় সুপ্তি।

গাইবান্ধা : ধর্ষণের চেষ্টায় অভিযুক্ত গাইবান্ধা সদর উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান বাদল, গিদারী ইউনিয়নের আলমগীর, মদনের পাড়া-রামচন্দ্রপুরসহ সারা জেলায় সংঘটিত নারী-শিশু নির্যাতন ও ধর্ষণকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ১২ জুন গাইবান্ধা শহরের ১নং ট্রাফিক মোড়ে এলাকাবাসীর উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন নারীমুক্তি কেন্দ্র গাইবান্ধা জেলা সভাপতি অধ্যাপক রোকেয়া খাতুন, সাধারণ সম্পাদক নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, ছাত্র ফ্রন্ট জেলা সভাপতি শামীম আরা মিনা, গিদারী ইউনিয়নের ভিকটিম রুবির স্বামী।

ভিকটিম জেমি আকতার বলেন, সারাদেশে যে একের পর এক নারী-শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটছে তার সুষ্ঠ বিচার না হওয়ায় এ সমস্ত ঘটনা অব্যাহতভাবে বেড়েই চলছে। নেতৃবৃন্দ এ সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণ হিসেবে অপসংস্কৃতি, অশ্লীলতা, মাদক-জুয়া-পর্নোগ্রাফির বিস্তার ও বিচারহীনতার সংস্কৃতিকেই দাবী করেন। অপরাধীরা প্রভাবশালী ও প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় থাকায় প্রশাসন তাদের গ্রেফতার করছে না বলে তীব্র সমালোচনা করেন।

রংপুর : বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র রংপুর জেলার উদ্যোগে গত ১ আগস্ট প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কামরুন্নাহার খানম শিখার সভাপতিত্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, ছাত্র ফ্রন্ট জেলা সভাপতি রোকনুজ্জামান রোকন, বেগম রোকেয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী টুম্পা খাতুন, শাপলা রায়।

গত ১ আগস্ট যশোরের চৌগাছায় সরকারি হাসপাতালের অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ এবং সরকারি এ্যাম্বুলেন্স চালুর দাবিতে বাসদ(মার্কসবাদী)সহ বামপন্থী দলগুলোর নেতৃত্বে গঠিত জনস্বাস্থ্য রক্ষা নাগরিক কমিটি বিক্ষোভ

পাহাড় ধসে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনসহ তিন দফা দাবিতে রাঙ্গামাটিতে স্মারকলিপি পেশ

বাসদ (মার্কসবাদী) রাঙামাটি জেলার পক্ষ থেকে ২২ জুন মানববন্ধন, সমাবেশ ও জেলা প্রশাসক বরাবরে স্মারকলিপি পেশ কর্মসূচি পালন করা হয়। বাসদ (মার্কসবাদী) রাঙ্গামাটি জেলা শাখার নেতা কলিন চাকমার সভাপতিত্বে ও মধুলাল চাকমার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক মুক্তা ভট্টাচার্য, চট্টগ্রাম জেলা আহবায়ক ফজলে রাব্বী, সুনীল কান্তি চাকমা।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন–পাহাড় ধসে শতাধিক মৃত্যু, বাসস্থান-ফসল-ফলের বাগানসহ সম্পত্তি ধ্বংসের ভয়াবহ ঘটনা নিছক প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়। বিষয়টির সাথে রাষ্ট্রীয় নীতি ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে যুক্ত। কেন বিপর্যয় ঘটলো তার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, দীর্ঘ সময় ধরে পাহাড় ব্যবস্থাপনা নিয়ে চলেছে অনিয়ম। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী জলবিদ্যুতের জন্য পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে উদ্বাস্তু করেছিল। সেসময় উপত্যকার মানুষ বাধ্য হয়ে উঠে এসেছে পাহাড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাহাড়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যক্রমে ভূতাত্ত্বিক ও প্রতিবেশগত বিষয়গুলো উপেক্ষা করা হয়েছে বারবার। ফলে বনভূমি ও পানির উৎসগুলো ধ্বংস হয়েছে। রাষ্ট্রীয় অবহেলা এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে এক শ্রেণির প্রভাবশালী মানুষ এ পাহাড়কে নির্বিচারে ব্যবহার করেছে। পাহাড় কাটা, দখল, মাটি বিক্রি, ইট ভাটা, বসতি, হোটেল-মোটেল ইত্যাদি স্থাপনা করেছে ব্যবসায়িক স্বার্থে। প্রাকৃতিক বন ধ্বংস করে বাণিজ্যিক বনায়ন করা হয়েছে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে ২০০৩ থেকে ১৫ সালের মধ্যে তিন পার্বত্য জেলায় ২৭.৫২% প্রাকৃতিক বন ধ্বংস হয়েছে। ৬১% পাহাড়ি ঝরনা শুকিয়ে গেছে। প্রাকৃতিক গাছ কেটে সেগুন, গজারি, রাবার ও ফলের বাগান তৈরি করাতে পাহাড়ের মাটি আলগা ও শুকিয়ে গেছে। ফলে এ সমস্ত কারণে পাহাড়ের ভারসাম্য হুমকির মুখে পতিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই ঘটনা একাধারে মানবিক, প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, ২০০৭ সালের পাহাড় ধসের ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে একটি রাষ্ট্রীয় সুপারিশমালা তৈরী হয়। সুপারিশে বলা হয়েছে, "ভূ-তাত্ত্বিক জরিপের মাধ্যমে মাটির ধারণ ক্ষমতা এবং পাহাড়ের ঢালের কোণ ও শক্তি নির্ণয় করে তার ভিত্তিতে পাহাড় ব্যবস্থাপনা করা। অবকাঠামো নির্মাণের জন্য অবশ্যই ভূ-তাত্ত্বিক সুপারিশ মেনে চলা।" ৩৬টি সুপারিশমালায় আরো বলা হয়েছে, " প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণসহ পাহাড়ের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো ইট ভাটার অনুমোদন না দেয়া, ৫ কিলোমিটারের মধ্যে আবাসন প্রকল্পের অনুমোদন নিষিদ্ধ করা।" কিন্তু এ সমস্ত সুপারিশ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি কেউই আমলে নেয়নি। ফলশ্রুতিতে আমরা আজকে এতবড় মানবিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছি। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণসহ সরকারি উদ্যোগে দ্রুত নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসন, পাহাড়ে প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ, ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ ছাড়া পার্বত্যস্থানে অবকাঠামো নির্মাণ বন্ধ, পাহাড় কাটা-দখল-অপরিকল্পিত বসতিস্থাপন-ইটভাটা নির্মাণ বন্ধ করা এবং পাহাড় ধসের চিহ্নিত কারণসমূহ রোধে ২০০৭ এ প্রণীত সুপারিশের ভিত্তিতে ভূ-তত্ত্ববিদ-পরিবেশবিদ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি গঠন করে সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরী ও বাস্তবায়ন করার দাবি জানান।

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ ও শিবদাস ঘোষ স্মরণ

(১ম পৃষ্ঠার পর) জীবন্ত বিশ্বকোষ।"

নেতৃবৃন্দ কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী জীবন ও সংগ্রাম তুলে ধরে বলেন, "লেনিনোত্তর সময়ে পার্টি গড়ে তোলার লেনিনীয় ধারণাকে বিকশিত করা, শুধুমাত্র রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, জীবন ও জ্ঞান জগতের সকল স্তরের সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকশিত ও সুনির্দিষ্ট উপলব্ধি দাঁড় করিয়েছেন। তিনি আধুনিক সংশোধনবাদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে সঠিক বিশ্লেষণ তুলে ধরেন, যা বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে আগামী দিনে পথ দেখাবে।"

অক্টোবর বিপ্লব উদ্‌যাপন কর্মসূচির ঘোষণা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) তার মধ্য দিয়ে মানুষকে দিয়েছে আশা ও অগ্রযাত্রার পথের দিশা।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ১৯ মে ২০১৭ ভাষা সংগ্রামী আহমদ রফিক ও অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে গঠন করা হয়েছে 'অক্টোবর বিপ্লব শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি'। এই কমিটি কর্তৃক আগামী ১লা অক্টোবর কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপনের কর্মসূচী শুরু হবে, ৭ই নভেম্বর একটি মহাসমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিলের মধ্য দিয়ে কর্মসূচী আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হবে। এই সময়ের মধ্যে দেশের প্রগতিশীল শ্রমিক-কৃষক-ক্ষেতমজুর-ছাত্র-যুব-নারী-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো ঢাকায় সভা-সমাবেশ-প্রদর্শনী-সেমিনার-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানামাত্রিক কর্মসূচি পালন করবে। দেশে ইতিমধ্যেই যেসকল জায়গায় স্বতস্ফূর্তভাবে অক্টোবর বিপ্লবের উদ্‌যাপনের কমিটি গঠিত হয়েছে, কর্মসূচি পালিত হচ্ছে, সেই সকল কার্যক্রমকে জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়। এছাড়া দেশের প্রতিটি জেলায় বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সমন্বয়ে অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপনে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। অনুষ্ঠানসর্বস্বতা নয়, বরং অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্য সকল মানুষের কাছে তুলে ধরে এদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যেই এই জাতীয় কমিটি কর্মসূচি পালন করবে বলে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান।

অবৈধ সিনেট নির্বাচন বাতিল ও অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ

২৯ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবনের সামনে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ চলাকালে সরকার সমর্থক শিক্ষকদের বাধা

গত ৮ আগস্ট অপরাজেয় বাংলায় প্রগতিশীল ছাত্র জোট ঢাবি শাখার মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে শিক্ষকদের হামলার নিন্দা জানিয়ে ডাকসু নির্বাচনের দাবির প্রতি সংহতি জানান একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগের শিক্ষক মোশাহিদা সুলতানা, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক সামিনা লুৎফা। তারা বলেন, "আজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেভাবে UGC'র ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র বাস্তবায়নে শিক্ষা বাণিজ্যের পথে হাঁটছে সে কারণেই তারা ডাকসু নির্বাচনের পক্ষে দাড়াঁবে না।" জোট নেতৃবৃন্দ বলেন, আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দখলদারিত্বের পরিবেশ চলছে, UGC'র শিক্ষা বাণিজ্যের কৌশলপত্র বাস্তবায়নে একের পর এক বিভাগে নাইটকোর্স খোলা হচ্ছে, ফি বাড়ানো হচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে ছাত্রদের কথা বলার জায়গা হতো ডাকসু। কিন্তু আজ দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে একে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগণতান্ত্রিক পরিবেশ ক্রমাগত বাড়ছে। ছাত্র প্রতিনিধিবিহীন অবৈধ সিনেট নির্বাচন হচ্ছে, যেখানে ছাত্ররা তাদের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে শিক্ষকদের লাঞ্ছনার শিকার হলো। প্রগতিশীল ছাত্রজোট এ ঘটনার প্রতিবাদ জানায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নির্মাণে ডাকসু নির্বাচনের দাবির আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নেবার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

৭টি কলেজের শিক্ষার্থীদের মিছিলে পুলিশি হামলার বিচার দাবিতে বিক্ষোভ

ঢাকায় কলেজ শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বর্বরোচিত পুলিশি হামলার প্রতিবাদে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ২১ জুলাই সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নাঈমা খালেদা মনিকার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা ও অর্থ সম্পাদক শরীফুল চৌধুরী। সমাবেশে সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা বলেন, "৭টি কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাজীবনের সংকট নিরসনের দাবিতে ঢাকার রাজপথে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল। কলেজসমূহ পরিচালনা করার কোনো নীতিমালা ছাড়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭টি কলেজের অন্তর্ভুক্তি বিদ্যমান সংকটকে আরো বৃদ্ধি করেছে। কলেজগুলোর সেশনজট, আবাসন, পরিবহন, গবেষণা, সেমিনার ও ক্লাসরুমের সংকট বিদ্যমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির ৬ মাস পেরিয়ে গেলেও চলমান সংকটসমূহ নিরসনের কোনো নীতিমালা ছাত্রসমাজের সামনে হাজির করা হয়নি। কিন্তু আমাদের সরকার তাদের প্রতিবাদটুকু সহ্য না করে পুলিশ বাহিনী দিয়ে সম্পূর্ণ ফ্যাসিস্ট কায়দায় শিক্ষার্থীদের শরীর বরাবর টিয়ারশেল-রাবার বুলেট মেরে লাঠিচার্জ করে প্রতিবাদী শিক্ষার্থীদের কণ্ঠরোধ করতে রাজপথ রক্তাক্ত করছে। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, একজন পুলিশ সদস্য সামান্য দূরত্বে অবস্থানরত শিক্ষার্থী সিদ্দিকুর রহমানের মুখ বরাবর টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এতে সিদ্দিকুরের দুটি চোখই মারাত্মকভাবে আহত হয়। সিদ্দিকুর রহমান আর দেখতে পাবে না। এ ঘটনার দায় সরকার কোনোভাবে এড়াতে পারে না। সিদ্দিকুরসহ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর এধরনের বর্বর আক্রমণ ও অজ্ঞাতনামা ১২০০ জন শিক্ষার্থীর ওপর মামলা সরকারের ফ্যাসিবাদী চরিত্রকে আরেকবার উন্মোচিত করলো। কোনো ধরনের ন্যায়সংগত আন্দোলন যেন দানা বাঁধতে না পারে এজন্য সরকার দমন-নিপীড়নের পথ বেছে নিয়েছে।" নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে হামলার সাথে জড়িত পুলিশ সদস্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান এবং ৭টি কলেজের সংকট নিরসনের দাবিতে সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

মেয়াদোত্তীর্ণ বয়লার মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে শ্রমিকদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বক্তারা বলেন - সরকার আগের ঘটনাগুলোতে যদি মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে সকল কারখানায় কাজের সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশ নির্মাণ করতো তাহলে কারখানাগুলোতে এভাবে শ্রমিকদের আগুনে পুড়ে, ভবন চাপা পড়ে এবং বয়লার বিস্ফোরণসহ নানাবিধ দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের মরতে হতো না। বাংলাদেশ সরকার শ্রমিকের জীবনহানির ঘটনায় দায়ী মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ দূরের কথা সরকার মালিক পক্ষের হয়ে এধরনের ঘটনায় গড়ে ওঠা শ্রমিক আন্দোলন পুলিশ, গুন্ডা-মাস্তান দিয়ে কঠোর হস্তে দমন করে।

বক্তারা আরো বলেন – শ্রম প্রতিমন্ত্রী ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে বলেছেন, বয়লার পরিদর্শন এবং এর নিরাপত্তা বিধানের দায় তার মন্ত্রণালয় নিতে পারবে না। তাহলে এই দায় কার? গতবছর গাজীপুরের ট্যাম্পাকো ফয়েল কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে ৩৮ জন শ্রমিক নিহত হওয়ার পর ঘোষণা করা হয়েছিল সকল কারখানার বয়লার পরীক্ষা করা হবে এবং বছরে অন্তত দুইবার নিরীক্ষা করে ফিটনেস সনদ নিতে হবে। কিন্তু তার কোনো অগ্রগতি যে ঘটেনি সেটা মন্ত্রী স্বীকার করেছেন নিজ মুখেই। তাহলে তিনি কোন নৈতিকতার বলে এখনো প্রতিমন্ত্রী হিসেবে স্বপদে বহাল আছেন?

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, অবিলম্বে সকল নিহত শ্রমিকের নাম পরিচয় প্রকাশ করতে হবে, যারা এখন পর্যন্ত নিখোঁজ আছেন তাদের পরিচয়ও প্রকাশ করতে হবে এবং সকল আহতদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি কোষাগার থেকে অনুদান দিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা চলবে না। অবিলম্বে শ্রম আইন বদল করতে হবে, নিহত সকল শ্রমিককে বাকি জীবনের আয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ভারতে বিজেপির গো-রক্ষার রাজনীতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) হেন কর্মকাণ্ডের পেছনের উদ্দেশ্যও এই। তবে এবারে এটা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এরকম সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা নিকট অতীতে আর দেখা যায়নি। প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করছে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়। যদিও এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ভারতের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট, স্বরূপনগরসহ কিছু এলাকায় গুজবকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা চলছিল। সাধারণ মানুষ তা রুখে দেয়। ভারতের বামপন্থী দল এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) এলাকায় এলাকায় সচেতন মানুষকে জড়ো করে শান্তি কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে।

রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের মাধ্যমে ফায়দা লোটার অপচেষ্টা বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী, বুর্জোয়া দলসমূহ এবং মৌলবাদী শক্তিসমূহও করে থাকে। এদেশের সকল শিক্ষিত-সচেতন-গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষকেও এব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত।

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের ৩য় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

সিলেট

চাঁদপুর

চট্টগ্রাম

ফেনী

গাজীপুর

অভয়নগর, যশোর

বামপন্থীদের যুক্ত আন্দোলনের ঘোষণা

(১ম পৃষ্ঠার পর) বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে আইনের শাসনের ছিটেফোটাও রাখা হচ্ছে না। বিরোধী দল ও মতকে দমন করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার তকমা আর উন্নয়নের কথা বলে বস্তুত সরকার তাদের যাবতীয় অপকর্মকে জায়েজ করার চেষ্টা করছে। বাতিল করার সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সরকার সংবিধানের ২য়, ৮ম সংশোধনী, প্রধানমন্ত্রীকেন্দ্রিক অগণতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোর ভিত্তি সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদসহ সকল অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক ও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাবিরোধী ধারা ও সংশোধনীসমূহ বহাল রেখেছে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। এসবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী প্রবণতা ও চরিত্র বিপজ্জনকভাবে প্রসারিত করা হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, গোটা নির্বাচনী ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। নির্বাচন পুরোপুরি টাকার খেলায় পর্যবসিত হয়েছে। দুর্নীতিবাজ, লুটেরা গোষ্ঠীর কালো টাকা, সন্ত্রাস, পেশীশক্তি, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, আমলাতান্ত্রিক খবরদারির কারণে বিদ্যমান ব্যবস্থায় সৎ, সংগ্রামী, নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও জয়লাভ প্রায় অসম্ভব করে তোলা হয়েছে। ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার এবং নির্বাচনের অবাধ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছাড়া সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের কোনো অবকাশ নেই।

সংবাদ সম্মেলনে গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিতকরণ, দলীয়করণ-দুর্নীতি-লুটপাট ও দখলদারিত্ব রোধ, সাম্প্রদায়িক জঙ্গীগোষ্ঠীর অপতৎপরতা বন্ধ, শ্রেণি-পেশাসহ জনজীবনের জরুরি দাবিসমূহ, জাতীয় সম্পদের মালিকানা সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত ও জাতীয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ ৫টি শিরোনামে আশু দাবি ঘোষণা করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় - লুটেরা পুঁজিপতি শ্রেণির নিষ্ঠুর শোষণমূলক ব্যবস্থা, বিদ্যমান স্বৈরতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান এবং অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থানসহ জনগণের গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে সকল গণতান্ত্রিক-অসাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী, ব্যক্তিবর্গসহ দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন জোরদার করতে হবে। এই পথে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কেন্দ্রিক লুটেরা ধনিক শ্রেণির দ্বি-দলীয় অপরাজনীতির বাইরে জনগণের নিজস্ব বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি-সমাবেশ গড়ে তুলতে হবে।

নদী ভাঙ্গন ও বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে বিক্ষোভ

বন্যা ও ভাঙন কবলিত মানুষকে দ্রুত পুনর্বাসনসহ পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ এবং নদী ভাঙন ও বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী)গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে ১৯ জুলাই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শেষে শহরের ১নং রেলগেটে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ (মার্কসবাদী) আহবায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, সদস্য সচিব মঞ্জুর আলম মিঠু প্রমুখ। বক্তারা বলেন, সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ নদী ভাঙনের কবলে পড়ে সর্বস্ব হারাচ্ছে। হাজার হাজার বিঘা আবাদী জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় ও ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় মৎস্যচাষীরা। এ অবস্থা থেকে দেশের মানুষকে রক্ষার জন্য নদী ভাঙন ও বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে দুর্গত মানুষদের পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ এবং মেডিকেল টিম গঠন করে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার দাবি জানান। একইসাথে নদী ভাঙন ও বন্যা কবলিত মানুষদের এনজিও এবং ব্যাংক ঋণ মওকুফ করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি করেন।

ব্রিটিশ শিক্ষকের দৃষ্টিতে নভেম্বর বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়া

(৩য় পৃষ্ঠার পর) অভিযোগ খণ্ডনের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তির অভাব হলেই তাকে দল থেকে বহিস্কৃত করা হয়। ...

এ ধরনের একটি সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে একজন দলচ্যুত সভ্যের বিরুদ্ধে দর্শকদের সামনে লালফৌজের একজন সৈনিক কতকগুলি উত্তেজনাপূর্ণ প্রশ্নের আবতরণা করল। এই কমিউনিস্ট কর্মী ১৯১৭ থেকে দলের সভ্য। কিন্তু লাল ফৌজের এই সৈনিকটি তাকে বলশেভিক থাকাকালেই শ্বেত রাশিয়ানদের পক্ষে লড়বার অভিযোগে অভিযুক্ত করল। এই সৈনিকটি। এ ব্যাপারের জন্যই বিশেষ করে তৈরী হয়ে এসেছিল। স্পষ্টতই এই ধরনের প্রশ্ন সেখানে সমাধান হওয়ার নয় এবং অভিযোগকারীকে সমস্ত তথ্য লিখে 'নির্দিষ্ট কমিশনের' কাছে পাঠাবার জন্য বলা হয়। একটা বিশেষ তদন্তের জন্য এটা স্থগিত রাখা হয়। অন্যান্য ব্যাপারে নারী পুরুষ যেই হোক না কেন, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করলে, তার নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের অবতারণা করা হয়ে থাকে। অন্য দেশের মতো সোভিয়েটে এ ব্যাপারে জনমতের মাপকাঠি রয়েছে এবং সেখানে জনমত কমিউনিস্টদের থেকে আদর্শ জীবন যাপনের দাবি রাখে। পরিশেষে কর্মস্থলে তার আচরণ, দায়িত্বহীনতা, অধীনস্থদের প্রতি কর্তৃত্বের ভাব, অলসতা এ ধরনের সমস্ত প্রশ্নই সেখানে আলোচিত হয়। ১৯৩৩ সালে রাজনৈতিক কার্যাবলিতে কপটাচরণের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দল থেকে অবাঞ্ছিতদের সরিয়ে দেওয়ার সময়ে যে সব কমিউনিস্ট তার পূর্বতন কার্যাবলী অকপটে ব্যক্ত করেছে, এমনকি বিপ্লবের সময়ে তার বিরুদ্ধ মনোভাবেরও প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি, তাদের বিরুদ্ধে আমি কোনও সমালোচনা শুনিনি। যতক্ষণ সে একটানা অকৃত্রিমভাবে তার পূর্বাপর ইতিহাস বলে গেছে ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে একটিও প্রশ্ন ওঠেনি। যখনই কেউ গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা করেছে বা কিছু লুকাবার ভাণ করেছে, তখনই দর্শকবৃন্দ ও উক্ত কমিশন তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছে। সোভিয়েটে রাজনৈতিক কপটতা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুতর দুর্নাম। কারো পূর্বতন কার্যাবলী সম্বন্ধে ভুল সংবাদ দেওয়া মানে এদেশের চাকরিপ্রার্থীর জন্য মিথ্যা সার্টিফিকেট দেওয়ার মতোই নিন্দনীয়। দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশের বহু কপট রাজনীতিবিদের সোভিয়েটের এই জনপ্রিয় যাচাই-ব্যবস্থার মতো ব্যবস্থায় পরীক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। ...

সোভিয়েট নাগরিকদের শুধু আমি উৎসাহভরে "আমাদের দল" ও "আমাদের সরকার" বলতে শুনিনি, অত্যন্ত গর্ব এবং আনন্দের সঙ্গে বার বার "আমাদের স্ট্যালিন" বলতেও শুনেছি। পাশ্চাত্য নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ধারায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের কাছে এসব স্থূল বলে মনে হবে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, এর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে আমার বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। ...

এমন কোন প্রমাণ নেই যে, স্ট্যালিন লোকের শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ নেহেরুর চাইতে বেশি আখ্যায় ভূষিত হন। লিঁও ফুচেট ওয়ানগার অন্যান্য বিষয়ের মতো স্ট্যালিনের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "এভাবে প্রশংসায় ভূষিত হওয়া স্ট্যালিন অত্যন্ত অপছন্দ করেন, মাঝে মাঝে এ নিয়ে হাসি তামাসাও করেন।" স্ট্যালিনের একটা বক্তৃতা আমার মনে আছে যাতে যারা কাজ করার বদলে নেতাদের কাছে এরূপ অভিনন্দনপত্র ও আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য ব্যগ্র, তিনি তাদের দস্তুরমত কশাঘাত করেন। ...

আজকে ব্রিটেনে, সারা দেশব্যাপী বেশি সংখ্যক জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে এরূপ কোনও রাজনৈতিক বা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা নেই। কাজেই কোনও নেতাকে শ্রদ্ধা না করে তাকে করতে হবে সমালোচনা, তার নীতি অনুসরণ না করে করতে হবে বাধা সৃষ্টি, এ হচ্ছে এখনকার সাধারণ মনোভাব। এ অবস্থার সঙ্গে আমরা এতখানি অভ্যস্ত হয়েছি যে এটাকে আমরা গণতান্ত্রিক ভাব বলেই অভিহিত করি। আসলে এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের অসুস্থ মনোভাবের লক্ষণ। যে গণতন্ত্রে সাধারণ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জনসাধারণের সংঘর্ষ বর্তমান, সেখানে গণতন্ত্রের অঙ্গচ্ছেদই হয়ে থাকে।

যখন কোনও গণতান্ত্রিক দেশে একটা প্রগতিশীল শক্তি ঐক্যের কথা বলে তখন তার মানে হচ্ছে এই : একটা সর্বজনীন প্রচেষ্টায় জনসাধারণ ও নেতাদের সম্মিলিত ঐক্য। আজকে এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় নেতাদের বেশি জনপ্রিয় হতে হলে তাদেরকে জনসাধারণকেও তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে। যদি স্যার ওয়াল্টার সিট্রাইন ও নেভিল চেম্বারলেন বলেন, "নেতা আসে, নেতা যায়, কিন্তু জনসাধারণ শাশ্বত", তখন অবশ্যই তাঁরা শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক বলে পরিচিত হবেন। আজকের তুলনায় জনসাধারণ তাদের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য শ্রদ্ধা জানাবে। কিন্তু 'গণতান্ত্রিক' সিট্রাইন ও চেম্বারলেন কেউই এই শব্দগুলি গঠন করেননি, এর গঠনকর্তা হলেন স্বয়ং 'একাধিপতি' স্ট্যালিন। ...

স্ট্যালিনের মতো ইউরোপের কোনও সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতাই জনসাধারণ যে ইতিহাসের সৃষ্টিকর্তা এটা উপলব্ধিই করেননি। কাজেই ইউরোপের সমসাময়িক কোনও রাজনৈতিক নেতা জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হননি। আমরা প্রায়ই লোকদের মধ্যে সোভিয়েটে স্ট্যালিনের প্রশংসা প্রসঙ্গে আলোচনা শুনতে পাই। একতরফা সমালোচনারও অন্ত নেই। আজকের সোভিয়েটের জনসাধারণ যদি তাদের নেতার গুণগান করার জন্য অভিযুক্ত হয় তবে সে নেতারও জনসাধারণের প্রশংসা করার জন্য অভিযুক্ত হওয়া উচিত। এই পারস্পরিক প্রশংসা হচ্ছে প্রকৃত গণতান্ত্রিক। ফ্যাসিস্ট নেতারা বা আমাদের ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক নেতারা কেউ আমাদের "শুধু জনসাধারণ শাশ্বত" এ কথা বলেন না। স্ট্যালিন এটা উপলব্ধি করেছেন এবং কথায়ও সেটা প্রকাশ করেছেন । সে কারণেই স্ট্যালিন দেশবরেণ্য। ...

সোভিয়েট রাশিয়া থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর আমাকে একটি প্রশ্ন বহুবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ঃ "ব্রিটিশ নাগরিকরা যেমন হাইড পার্কে মিলিত হয় চেম্বারলেনের বিরুদ্ধে প্রচারমূলক কাজ চালাতে পারে, সোভিয়েট নাগরিকরা কোনও পার্কে গিয়ে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে সেরূপ কিছু বলতে পারে কি?" ব্রিটিশ গণতান্ত্রিকদের কাছে এ হচ্ছে গোড়ার কথা। আমার উত্তর হচ্ছে, সোভিয়েটে কোনও নাগরিক পার্কে গিয়ে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে কিছু বললে জনসাধারণ তাকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাধ্য করবে। ...

সাম্যবাদী নয় অথচ সমাজতান্ত্রিক, এরকম লোক সব সময়ে অভিযোগ করে থাকেন যে, সোভিয়েটে আজ কমিউনিস্ট দলের স্বৈরতন্ত্র চলছে। ওরা শুধু যে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে তা নয়, সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ও লোকপ্রিয় সংঘগুলোতেও তারা আধিপত্য করে। কী করে তারা অন্যান্য সংঘগুলোর উপর আধিপত্য করে? তারা দলের সভ্যদের জন্য অফিস সংক্রান্ত নির্বাচনে বেশি সমর্থন লাভ করে। এতে তারা এতখানি সাফল্য লাভ করে যে, বিভিন্ন দলের পরিচালক সমিতিতে পার্টি সভ্যই থাকে বেশি। এতে অনিষ্টকর বা অগণতান্ত্রিক কিছুই নেই। আজ ব্রিটেনে যদি এরূপ একটি লোকপ্রিয় রাজনৈতিক দল থাকে যেখানে শ্রমিকশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব ক্ষমতা আছে, তবে আজ সোভিয়েট রাশিয়ায় যে অবস্থা বিদ্যমান এই দেশেও আমরা সেরূপ একটা অবস্থায় পৌঁছতে পারব। তখন আমরা দেখতে পাব যে, এই দলই শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবে। এবং জনসাধারণ তাদের অনুসৃত নীতি থেকে উপকৃত হওয়ার ফলে এই দলের সভ্যদের করবে সমর্থন। শুধু স্থানীয় বা জাতীয় নির্বাচনে নয় – ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমস্ত গণতান্ত্রিক সংঘেও। কার্যত আমরা দেখতে পাব যে যদি জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি নিয়ে একটি প্রকৃত জনগণের দল গড়ে ওঠে, তা হলে জনসাধারণ প্রত্যেক গণতান্ত্রিক সংঘের নির্বাচনে সেই দলের সভ্যদেরই সমর্থন করবে, কারণ তারা তখন জানতে পারবে যে এ অবস্থায় দলের সভ্যই ঐক্য ও আকাঙ্ক্ষার একমাত্র প্রতীক। এ ধরনের দল আমাদের পার্লামেন্টারি দল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোতে শ্রেষ্ঠ নাগরিকরা থাকবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। সোভিয়েটে দলে বিশুদ্ধকরণের যে প্রক্রিয়া তাতে শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ নাগরিকরাই দলে থাকতে পারেন। আমাদের এখানে তেমন যাচাই করার কোনও ব্যবস্থা নেই। এখানে দলের সভ্যরা ইচ্ছা করলে অর্থের জোরে নির্বাচনে দাঁড়াতে পারে।...

১৯৩১ অবধি সোভিয়েটে বাস করে আমার এ ধারণা হয়েছে যে, যদি ব্রিটেনে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষাকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয় তবে সে দল উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবেই। সেটিই হবে দেশে একমাত্র অগ্রগামী শক্তি, সেটি হবে জনগণের সংগঠিত অগ্রবাহিনী এবং সেই দলের নেতারা তাদের কাজ ও নীতির জন্য সাধারণ শ্রেণির লোকের সমর্থন পাবে। আজকে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কমিউনিস্ট দল ও তার নেতারা– স্ট্যালিন, মলোটভ, কালিনিন, ভরোশিলভ, কাগানোভিচ যেরূপ পেয়ে থাকেন, তাঁরাও ঠিক সেরূপ সমর্থন পাবেন। ...

সোভিয়েটে সাধারণ নর-নারী দৈনন্দিন যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় স্ট্যালিনের বক্তৃতা হচ্ছে তারই একটা জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। স্ট্যালিন স্বর্গ থেকে এসব বক্তৃতার বিষয়বস্তুর প্রেরণা পান না, পান সারা দেশব্যাপী অজস্র প্রস্তাব, স্থানীয় সমস্যার মীমাংসা, সুপারিশ, পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠি, দলের নেতৃবৃন্দ ও সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরিত অভিযোগ থেকে। স্থানীয় সমস্যা, সুপারিশ ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচুর খবরাখবর সংগ্রহ না করে সোভিয়েট কেন্দ্রীয় দল বা সরকার কোনও মীমাংসায় উপস্থিত হয় না।

কয়েকটি লোক আমাদের বিশ্বাস না করিয়ে ছাড়বে না যে, স্ট্যালিন নিজেই সোভিয়েট নীতির সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করে থাকেন। নেতা হিসাবে স্ট্যালিনের একটা অত্যাশ্চর্য গুণ এই যে, নেতৃত্ব দেওয়ার সময়ে তিনি এমন নীতি বলে দেন যা সমস্ত জনসাধারণের হিতকর হয়। স্ট্যালিন নিজেও এটা বহুবার বলেছেন যে, সাধারণ মজুর শ্রেণির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সমিতির উপদেশ তেমন কোনও কাজে আসে না। কাজেই স্ট্যালিন যখনই কোনও ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তখনই জোর গলায় বলেছেন যে তাঁর বক্তব্য সমস্ত জাতির মনের কথার প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়।...

১৯৩৮ সালে যখন আমি সোভিয়েট ইউনিয়নে আমার কাজে যোগ দিলাম তখন কারও মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে, সোভিয়েটের বহু পদস্থ ব্যক্তিদের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার অপরাধে গুলি করে মারা হবে।...

পাঠকরা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে তাঁদের প্রতি ওই অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের কারণ কী? কী কারণে তাঁদের বর্তমান নেতৃস্থানীয়দের তুলনায় দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অবিশ্বস্ত বলে মনে করা হতো? এর উত্তর মিলবে অতীত গৃহ-ইতিহাসে এবং সোভিয়েট বিপ্লবের ইতিহাসে। এই ইতিহাস সম্বন্ধে ব্রিটিশরা অত্যন্ত অল্পই জানে এবং সোভিয়েট এলাকায় যাওয়ার পরই এর প্রকৃত ইতিহাস জানা যায়। ইংল্যান্ড থেকে দেখে মনে হয়েছিল যে লেনিন ও ট্রটস্কি, কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ হলেন রুশ বিপ্লবের নেতা। যাঁরা বক্তৃতামঞ্চে দেখা দিতেন বা বড় বড় রাজনৈতিক ম্যানিফেস্টো ও ইস্তাহার লিখতেন আমরা একমাত্র তাঁদেরই বিষয় জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু সেই বড় বড় নেতাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং তার সংগ্রাম ও সমাধান সম্বন্ধে কিছু জানতে পারিনি।

১৯১৭ সালে প্রবাসী বলশেভিকরা লেনিনের সঙ্গে রাশিয়ায় ফিরে এলেন। ট্রটস্কিও ফিরলেন তাঁদের সঙ্গে। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর বৈপ্লবিক কর্মপন্থা জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করলেন। এবং মাত্র ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে যখন দেশব্যাপী বলশেভিকদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে তখন তিনি এসে যোগ দিলেন সেই পার্টিতে।...

১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে উদ্ভব হলো গুরুতর পরিস্থিতি। বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পেট্রোগাডে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গেলেন এবং পরাজিত হওয়ার পর সংবাদপত্রে সে সম্বন্ধে ফলাও করে জাহির করলেন। ফলে বিদ্রোহের গোপন সিদ্ধান্ত পর্যন্ত জানাজানি হয়ে গেল। এঁদের সঙ্গে পূর্বেকার সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও লেনিন এঁদের তীব্র সমালোচনা করলেন এবং পার্টি থেকে এঁদের বহিস্কার দাবি করলেন। তিনি বললেন –"কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ তাঁদের মতো অন্যান্য ভ্রান্ত ও বিপথগামী ব্যক্তিদের একত্র করে দল গঠন করুন। এবং সে দলে কোনও শ্রমিক যোগ দেবে না।" এর কিছু পরেই তিনি একটি চিঠিতে এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে –"শ্রমিকদের পার্টির স্বাস্থ্যরক্ষার একমাত্র পথ হলো তার মধ্যে যে বারোজন মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধিজীবী রয়েছেন তাঁদের বের করে দেওয়া, বিপ্লবীদের সংগঠিত করা এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি পূর্ণ করে বিপ্লবী মজুরদের হাতে হাত দিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া।" ১৯১৭ সালে পার্টি যখন বাস্তব ও গুরুতর কাজের সম্মুখীন এবং কেন্দ্রীয় কমিটি শুধু বে-আইনি ইস্তাহার প্রকাশ ও পাঠানোতেই আবদ্ধ, লেনিন তখন নেতৃত্বের মধ্যকার বারোজন মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধিজীবীদের বহিস্কারের কথা বললেন। নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিপ্লব সম্বন্ধে কয়েকজনের নিজেদের পৃথক পৃথক নীতি ছিল যার সঙ্গে পার্টি নীতির আদৌ কোনও যোগ ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ট্রটস্কি বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিজের পুরনো নীতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে শুধুমাত্র রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, কেন না তার জনসংখ্যার অধিকাংশ হল কৃষক এবং কৃষকরা সর্বদা প্রতিবিপ্লবী শক্তি। একমাত্র সমগ্র ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হলে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বলশেভিকদের 'ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম' নীতির, যে নীতির ফলে পার্টির বিভিন্ন কমিটির নির্দেশ সমস্ত পার্টি সভ্যদের অবশ্য পালনীয়, ট্রটস্কি বরাবর তার বিরোধী ছিলেন। বিপ্লবের দশ বছর পূর্বে তাঁর 'আওয়ার পলিটিক্যাল টাস্কস' বইয়ে ট্রটস্কি বলশেভিক পার্টি সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "কোথায় যেন উঁচুতে, খুব উঁচুতে কেউ একজনকে কোথায় আটক করে রাখছে, তার পদচ্যুতি ঘটাচ্ছে, তার শ্বাসরোধ করছে। আবার কেউ একজন এসে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রচার করছে। এবং তারই ফলে কমিটির চূড়ায় পতাকা উড়ছে বিজয়গর্বে। পতাকায় লেখা– গোঁড়ামি, কেন্দ্রীয় নির্দেশ, রাজনৈতিক সংগ্রাম"। জারের শাসন সম্বন্ধেও এর চেয়ে কড়া সমালোচনা করা যেতে পারত না। কিন্তু আজও ট্রটস্কির কলম থেকে এই ধরনের নিন্দাবাদ সমান স্রোতে বেরিয়ে আসছে–লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক পার্টির বিরুদ্ধে নয় – স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

১৯১৮ সালে তাঁর বৈপ্লবিক নীতির ভিত্তিতে ট্রটস্কি জার্মানির সঙ্গে শান্তি স্থাপনের বিরোধিতা করেন। বুখারিন, রাডেক এবং আরও কয়েকজন লেনিন ও স্ট্যালিনের বিরোধিতা করে ট্রটস্কিদের দিকে গেলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা একটি 'বামপন্থী কমিউনিস্ট দল' খাড়া করলেন। বললেন, লেনিন হচ্ছেন দক্ষিণপন্থী এবং অবশেষে সোস্যাল রেভোলিউশনারিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বলপূর্বক নিজেদের দলীয় শাসন কায়েম করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। যদি ১৯১৯ সালে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ তাঁদের ইচ্ছানুরূপ অগ্রসর হতে পারতেন তাহলে আজ আর সোভিয়েট শাসনের কোনও অস্তিত্বই থাকত না। যদি ১৯১৮ সালে ট্রটস্কি এবং বুখারিন তাঁদের নিজেদের পথে কাজ করতে পারতেন তাহলে সোভিয়েট গণতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী জার্মানির সামরিক শাসনের নিচে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেত। এসব পুরনো কথা তুলে নোংরা কাঁথা ধোবার ইচ্ছা আমার নেই, তবে দু'কারণে আমি এ কথার পুনরাবৃত্তি করছি। প্রথমত, কী কারণে সোভিয়েটের নাগরিকদের কাছে এসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অবিশ্বস্ত বলে প্রতিপন্ন হলেন। দ্বিতীয়ত, এসব ব্যক্তিরাই সোভিয়েট বিপ্লবের নেতা এই মর্মে আমাদের সংবাদপত্রে যে সব খবর বেরিয়েছে তা যে মিথ্যা তা প্রমাণ করার জন্য। তাঁরা মাঝে মাঝে ভাল কাজ করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁদের নীতি কাজে লাগালে দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো। ...

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা বলে সরকার দায় এড়াতে পারে না

(শেষ পৃষ্ঠার পর) উন্নয়ন প্রকল্প এই ঢাকাকে ঘিরেই। এই শহরের এমন কিছু অঞ্চল রয়েছে যেখানে দিন-রাতের পার্থক্য বোঝা যাবে না; পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলোর মতোই উজ্জ্বলতা সেখানে। কিন্তু আরেকটি চিত্রও আছে। এই শহরটি গড়ে উঠেছিল বুড়িগঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করে। পাশে ছিল আরও নদী- তুরাগ, বালু। ৫০ বছর আগের ঢাকাতেও ছিল জলাশয়, গাছপালা, বেঁচে থাকার মতো পরিবেশ। আজ তার অবস্থা কী? বুড়িগঙ্গা নদী আজ বিষাক্ত। ময়লা-আবর্জনার ভাগাড়; দুর্গন্ধে টিকে থাকা দায়। প্রতিনিয়ত এর আয়তন কমছে। চর দখল করে স্থাপনা নির্মাণ করেছে দখলদাররা। এই শহরে একসময় অজস্র খেলার মাঠ ছিল। আজ তার বেশিরভাগগুলোতে উঠেছে সুউচ্চ দালানকোঠা, মার্কেট। ইট, পাথর আর কংক্রিটে ঢাকা এই শহরে এখন একখণ্ড মাটি খুঁজে পাওয়া কঠিন। সারি সারি বাড়ি কিন্তু যাবার রাস্তা নেই। অসুস্থ হলে অ্যাম্বুলেন্স ঢোকানোর অবস্থা নেই। পানি নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ভীষণ দুর্বল। যত্রতত্র ময়লা ফেলার স্থান। পানি যাবার জায়গা নেই বলে এক ঘন্টার বৃষ্টিতে কোমর সমান পানির উচ্চতা। এর সাথে আরও বর্জ্য মিশে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এমন কিছু অঞ্চল আছে যেখানে সারাবছর মানুষ পানিবন্দী থাকে। মাত্রাতিরিক্ত যানবাহন আর তা থেকে নির্গত ধোঁয়া, সিসা, বিষাক্ত গ্যাস নিঃশেষ হবার জায়গা নেই বলে ঢাকা এখন দুনিয়ার সবচেয়ে বিষাক্ত বায়ুর শহর। এ সবই হয়েছে সরকারের তথাকথিত 'উন্নয়ন'র বিষাক্ত ছোবলে। গত চার দশকে এমন উন্নয়নের ফলাফলে নদীনালা, খালবিল, বন জঙ্গল সবকিছু ধ্বংস করার প্রক্রিয়া চলেছে। যখন যারা ক্ষমতায় এসেছে তারা প্রত্যেকে এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ছিল। তাই পাহাড় থেকে পীরগঞ্জ সবক্ষেত্রেই প্রকৃতি এবং মানুষ সমানভাবে আক্রান্ত হয়েছে।

গত কিছুদিন আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড় ধসে মারা গেল ১১২ জন। এর আগেও এমন মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এবার ঘটলো ভয়াবহতম ঘটনা। ঘটবেই না বা কেন? প্রতিবছর পাহাড় কাটা হচ্ছে। পাহাড়ে দখলদারদের সহযোগিতায় অবৈধ বাড়িঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। বন উজাড় করে, মাটি কেটে পাহাড়ে 'উন্নয়ন' চলছে বহুদিন ধরে। এবারের ঘটনা তারই প্রতিক্রিয়ায়। প্রকৃতি ধ্বংস হলে যে মানুষের অস্তিত্ব থাকে না, তা এ ঘটনায় আরও একবার প্রমাণিত হলো। কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জসহ উত্তরবঙ্গে কয়েকটি জেলায় হলো ভয়াবহ বন্যা। বিশেষত ভাটি অঞ্চলের বন্যায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ হতে হলো। সহায়-সম্বল সব হারিয়ে রিক্ত-নিঃস্ব-অসহায় মানুষগুলো কোথায় যাবে, কেউ জানে না। ঢাকা শহরে কিছুদিন আগে মহামারী আকারে দেখা দিলো 'চিকনগুনিয়া' একটি মশাবাহিত রোগ। অন্তত ২০ লাখ লোক মশার কামড়ে আক্রান্ত হয়ে আজও যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। এর আগে ডেঙ্গু মহামারী আকার নিয়েছিল, এখন জন্ডিস হচ্ছে অনেকের। তার কিছুদিন আগে হলো তীব্র দাবদাহ। আগে শোনা যেত ভাদ্রমাসের গরমে কাঠাল-তাল পাকে। এখন গরমের পরিমাণ এমন যে মনে হয় মানুষও পেকে যাবে। হিটস্ট্রোকের যোগাড় অনেকের।

সাধারণ চোখে এই বিপর্যয়গুলো দেখলে মনে হবে এগুলো প্রাকৃতিক ঘটনা। সরকারও তাই বলে। প্রকৃতি নামের 'নন্দ ঘোষ'র উপর নিজেদের দায় চাপায়। কিন্তু চাইলেই কি এই দায় থেকে মুক্ত হওয়া যায়? আমরা জানি, প্রকৃতিতে বিপর্যয় যেমন আছে তেমনি আছে তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও। যেমন ঘূর্ণিঝড় গাছপালার ক্ষয়ক্ষতি করে আবার ভাঙা গাছের ডাল থেকে নতুন চারার জন্ম হয়। যেটা আমরা সুন্দরবনে দেখলাম সিডর, আইলা হবার পর। নদী-নালা উপচে যেমন বন্যা হয়, বন্যায় জান-মালের ক্ষতি হয়; তেমনি বন্যার পানি বয়ে নিয়ে আসে পলিমাটি যাতে মাটি উর্বর হয়, ভালো ফসল হয়। মানুষ বহু সংগ্রাম থেকে, প্রকৃতির সাথে বহু অভিজ্ঞতায় এসব নিয়মকে আয়ত্ত করেছে; নিয়মকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের কল্যাণে ব্যবহার করেছে। মানুষ তার অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছে প্রকৃতিকে পদানত করলে সভ্যতার অস্তিত্বই থাকবে না। পশু-পাখি, জীব-জন্তু, গাছ-পালা, নদী-নালা মানুষের বেঁচে থাকার জন্যই প্রয়োজনীয়। একে ধ্বংস করে মানুষ টিকে থাকতে পারবে না।

নদীর পানি সমুদ্রের দিকে গড়াবেই। মেঘ বৃষ্টি ঝড়াবেই। এটাই প্রকৃতির কাজ। কিন্তু নদীর প্রবাহমানতার মাঝে যদি বাঁধ দেয়া হয়, তাহলে কী দাঁড়াবে? নদী যদি বিগড়ে যায়, তাহলে সেটা প্রকৃতির ঘাড়ে চাপানো যাবে? পাহাড় বিশেষ প্রাকৃতিক কারণে গড়ে ওঠে। মাটিকে শক্ত করে ধরে রাখে। সেই পাহাড় কেটে, তার বুকে বেড়ে ওঠা গাছপালা যদি কেটে একটা ভারসাম্যহীন অবস্থা তৈরি করা হয় তাহলে পাহাড় ধসকে কি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা যাবে? বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ন্যূনতম দায়িত্ব পালন না করে যদি ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়ার দায় নাগরিকদের উপর দেয়া হয় তাহলে কি তা সঠিক হবে? তাহলে যারা দেশ চালান, শহর চালান তাদের দায়িত্ব কী?

প্রকৃতি তার নিয়মে চলে। মানুষের উচিত সেই নিয়মকে অনুধাবন করে তার অনুপাতে কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত করা। যেমন মেঘালয়ের পাহাড়ের ঢল আমাদের সুনামগঞ্জের ভেতর দিয়ে প্রায় আট হাজার কিলোমিটার নিচু ভূমি দিয়েই বয়ে যাবে। এটাই প্রাকৃতিকভাবে নির্ধারিত ব্যাপার। আবার এই পানি স্বাভাবিকভাবে পরিচালনার জন্য ভারতীয় সীমান্তের সাথে আমাদের ২০টিরও বেশি আন্তসীমান্ত নদী আছে। কিন্তু এসব নদী যদি সঠিক সময়ে ড্রেজিং না হয়, যদি ভরাট থাকে, যদি ভারত বা বাংলাদেশ সরকার এই পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে কোনো বাধা তৈরি করে তাহলে অনিবার্যভাবে বন্যা হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য, নদীশাসনের নামে নদীর নিয়মের বিরুদ্ধে যাবার কারণেই আজ এমন পরিণতি হচ্ছে। ফলে আজ আমাদের ভাটি অঞ্চলের যে বন্যা হচ্ছে তা প্রাকৃতিকভাবে যতটা না তার চেয়ে অনেক বেশি মনুষ্যসৃষ্ট। একইভাবে পাহাড় ধসে মারা যাবার ঘটনাও পাহাড়কে ঘিরে মুনাফার থেকেই তৈরি হয়েছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের এমন ঘটনাগুলো নতুন নয়। একইভাবে নতুন নয় এই বিপর্যয়কে হাতিয়ার করে লুটপাটের ঘটনাও। প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে একদল লোকের পকেট ভারী হয়। কেননা জনগণকে উদ্ধারের কথা বলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকা তছরুপ করা যায়। এবারও যেমন হাওর অঞ্চলের বিপর্যয়ের কথা বলে একটি মাস্টারপ্ল্যান করা হয়েছে। মাস্টারপ্ল্যানের নামে এক উচ্চাভিলাষী প্রকল্প নেয়া হয়েছে। ২০১২-২০৩২ সাল পর্যন্ত এই প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে ২৮ হাজার ৪৩ কোটি টাকা। এর আগেও এমন কোটি কোটি টাকা হাওর অঞ্চলের উন্নয়নের কথা বলে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের কথা বলে বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু জনগণের টাকাগুলো লুটপাট ছাড়া যে আর কিছুই হয়নি তা এবারের বন্যা পরিস্থিতি দেখে খুব সহজেই বোঝা যায়।

দেশিয় লুটেরারা কেবল নয়, আমাদের প্রকৃতি-পরিবেশের উপর আক্রমণ করছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোও। পাশের দেশ ভারত আমাদের নদীগুলোর উপর আগ্রাসন চালিয়ে আসছে বহু বছর ধরে। ভারতের বাঁধের কারণে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে যেমন মরুকরণ চলছে তেমনি দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে পানিতে লবণাক্ততা বাড়ছে। উত্তরবঙ্গে পানির স্তর অনেক নীচে নেমে গেছে, তীব্র হচ্ছে আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাব। দক্ষিণবঙ্গে পানির লবণাক্ততার কারণে কৃষিব্যবস্থা পুরোপুরি বিপর্যয়ের সম্মুখীন। যশোর-খুলনায় ভবদহ জলাবদ্ধতায় প্রতিবছর মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। বহু আন্দোলন-সংগ্রামের পরও এখনও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। নতুন করে সুন্দরবনের পাশে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎপ্রকল্প নির্মাণ করা হচ্ছে। ভারত এবং বাংলাদেশের পুঁজিপতিদের স্বার্থে বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং অনেকগুলো শিল্প কারখানা সুন্দরবনের চারপাশে গড়ে উঠছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন পুরোপুরি ধ্বংসের মুখে পড়বে। একইসাথে সেখানকার নদী-কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, দুর্গত হবে লক্ষ লক্ষ মানুষ। সুন্দরবন ধ্বংস হলে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় চারকোটি মানুষ সরাসরি আক্রান্ত হবে, একইসাথে আক্রান্ত হবে পুরো দেশ।

তাই একথাটি খুব সহজেই বলা যায়, প্রকৃতির বিপর্যয় ডেকে আনছে মানুষের বিপন্নতা। আর দুইয়ের বিপর্যয় তৈরি করছে মুনাফালোভী শাসকরা। শাসকদের লোভ আর লাভের বলি হচ্ছে কোটি কোটি মানুষ। একথা আজ স্পষ্টভাবে অনুধাবনের সময় এসেছে যে, প্রকৃতি, চারপাশের পরিবেশ আর মানুষের বেঁচে থাকা একসূত্রে গাঁথা। তাই নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই প্রকৃতিবিনাশী যেকোনো অপতৎপরতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। শাসকরা যাকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে চিত্রিত করে তা যে তাদের নিজেদেরই সৃষ্টি তাও আজ পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে হবে। একইভাবে প্রকৃতি এবং মানুষের নিদারুণ পরিস্থিতির জন্য যে মুনাফাকেন্দ্রিক ব্যবস্থা দায়ী, তার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হতে হবে।

'জ্বালানী ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা (২০১৭-৪১)' জাতীয় কমিটি প্রস্তাবিত খসড়া রূপরেখা উত্থাপন

নবায়নযোগ্য জ্বালানীকে গুরুত্ব দিয়ে, মানুষ ও প্রকৃতিবান্ধব উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনাকে ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি ২২ জুলাই ২০১৭ জাতীয় প্রেসক্লাবে এক জনাকীর্ণ অনুষ্ঠানে সরকারের বাংলাদেশের জ্বালানী ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা (২০১৭-৪১)-এর বিপরীতে জাতীয় কমিটির প্রস্তাবিত খসড়া রূপরেখা উত্থাপন করেছে।

প্রস্তাবিত রূপরেখায় বলা হয় 'সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, দেশি-বিদেশি কতিপয় গোষ্ঠীর আধিপত্য থেকে মুক্ত হলে দেশ ও জনগণের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি না করে সর্বোচ্চ চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো সম্ভব।' প্রস্তাবে বলা হয় এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে, 'সকল নাগরিকের জন্যে সুলভে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিত, নিরাপদ-ঝুঁকিহীন ও পরিবেশসম্মত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ এবং জাতীয় সক্ষমতার উপর দাঁড়িয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনমান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।'

সরকার ও জাতীয় কমিটির প্রস্তাবের তুলনামূলক অবস্থান তুলে ধরে বলা হয়, সরকারের পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য হলো আমদানি ও রাশিয়া-চীন-ভারতের ঋণ নির্ভরতা। যা পরিবেশ বিধ্বংসী। সরকারের বিদ্যুৎ উৎপানের প্রধান উৎস হলো কয়লা, এলএনজি ও পারমাণবিক চুলা এবং মূল চালিকা শক্তি হলো বিদেশি কোম্পানী অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান ও কনসালটেন্ট। এর বিপরীতে জাতীয় কমিটির প্রস্তাবে বলা হয়, মূল বৈশিষ্ট্য হবে দেশের সম্পদ নির্ভরতা। রাশিয়া-চীন-ভারতের ঋণমুক্ত ও পরিবেশ অনুকূল। বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উৎস ধরতে হবে প্রাকৃতিক গ্যাস ও নবায়নযোগ্য জ্বালানীকে। মূল চালিকা শক্তি হবে জাতীয় সংস্থা, দেশীয় প্রতিষ্ঠান ও জনউদ্যোগ।

প্রস্তাবে বলা হয়, ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের টার্গেট নির্ধারণ করে সরকার ১২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের যে পরিকল্পনা নিয়েছে তার বিপরীতে ১১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে টার্গেট থেকে অনেক বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। প্রস্তাবে বলা হয়, বিদ্যুতের দামও এক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী (২০১৫-এর দামস্তর অনুযায়ী) ১২.৭৯ টাকা বিপরীতে ৫.১০ টাকায় আনা সম্ভব।

সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবে ভিআইপি লাউঞ্জে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন রাজনীতিক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য ড. আব্দুল হাসিব চৌধুরী, প্রকৌশলী মাহাবুব সুমন, ড. সুজিত চৌধুরী, রাজনীতিক সাইফুল হক, জোনায়েদ সাকী, টিপু বিশ্বাস, রুহিন হোসেন প্রিন্স, মোশরেফা মিশু, জাহিদুল হক মিলু, আজিজুর রহমান, নাসিরউদ্দিন নসু, ফখরুদ্দিন কবির আতিক, মহিনউদ্দিন চৌধুরী লিটন, মাসুদ খান, সামছুল আলম প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার অসংখ্য প্রতিনিধিরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন – সরকার যখন পশ্চাতমুখী, লুণ্ঠন ও ধ্বংসমুখী, নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক উন্নয়ন চিন্তার অধীনে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তখন প্রায় দুই দশকে জনআন্দোলনের শক্তি ও আকাঙ্ক্ষার উপর দাঁড়িয়ে আমরা ভবিষ্যতমুখী, প্রগতি ও সমতামুখী প্রবৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক, প্রাণ-প্রকৃতি ও মানুষের স্বার্থপন্থী উন্নয়ন চিন্তার কাঠামোতে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনার খসড়া উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন, আমরা কখনও দ্বিমত করিনি যে আমাদের বিদ্যুৎ প্রয়োজন। কিন্তু এটা দেখিয়ে সুন্দরবনবিনাশী রামপাল কয়লা প্রকল্পের প্রয়োজন নেই। সরকার যেভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চায় এটা হলে দেশ ঋণের শৃঙ্খল ও আধিপত্যের মধ্যে পড়বে, পানি-মাটি-পরিবেশ বিপর্যস্ত হবে। এর থেকে বেরিয়ে আসতে জাতীয় কমিটি বিকল্প প্রস্তাবনা হাজির করছে। আমরা যথাযথ নীতি গ্রহণ করলে ২০৪১ সাল পর্যন্ত দেশের গ্যাস চাহিদা নিজেদের গ্যাস থেকেই মেটাতে পারব। সেজন্য রপ্তানিমুখী চুক্তি বাতিল, বাপেক্সকে কাজের সুযোগ দেওয়া, জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্থলভাগ ও গভীর অগভীর সমুদ্রে নিয়মিত অনুসন্ধান চালাতে হবে। তিনি বলেন শুধু এলএনজি আমদানির কথা বলা হচ্ছে, এর ফলে গ্যাসের দাম বাড়বে এবং বিদ্যুতের দামও বাড়বে। নবায়নযোগ্য জ্বালানীর কথাও সরকার বলে। বিদেশে এ নিয়ে ঢাক-ঢোল পেটানো হচ্ছে অথচ দেশে কোনো অগ্রগতি নেই। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিবেশবিনাশী পথ বাতিল করে নবায়নযোগ্য জ্বালানী নির্ভরতার টার্গেট নির্ধারণ করেছে। অথচ আমরা এসব চিন্তা করছি না। তাই দেশের সৌর-বায়ু-বর্জ্যের ব্যবহার বাড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

অন্যান্য বক্তারা বলেন, এটি প্রস্তাবিত খসড়া। চূড়ান্ত করার জন্য বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন মহলের পরামর্শ নেওয়া হবে। বক্তারা সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনাদের মহাপরিকল্পনা জনগণ জানে না। আমরা আজ প্রকাশ্যে আমাদের বিকল্প প্রস্তাব পেশ করলাম। এ বিষয়ে আমরা আপনাদের মতামতও প্রত্যাশা করছি।

সভায় জানানো হয় প্রস্তাবিত খসড়া উন্মুক্ত থাকবে যে কেউ এ বিষয়ে মতামত দিতে পারবেন এবং জাতীয় কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞসহ দায়িত্বশীলদের সাথে আলোচনা করা হবে।

সরকার ও মালিকের অবহেলায় মেয়াদোত্তীর্ণ বয়লার মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে শ্রমিকদের

গাজীপুরের কাশিমপুরের নয়াপাড়া এলাকায় মাল্টিফ্যাবস লিমিটেড-এ মেয়াদোত্তীর্ণ বয়লার বিস্ফোরণে ১৩ জন শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের উদ্যোগে ৫ জুলাই ২০১৭ বুধবার বিকাল সাড়ে ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ৭ জুলাই বিকেল সাড়ে ৪টায় গাজীপুরের মাল্টিফ্যাবস পোশাক কারখানার সামনে গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অবিলম্বে মালিককে গ্রেফতার, নিহত শ্রমিকের এক জীবনের ক্ষতিপূরণ প্রদান, আহত শ্রমিকের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং ক্ষতিপূরণ আইন সংশোধনের দাবি করা হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ও গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের অন্যতম নেতা আ ক ম জহিরুল ইসলাম। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রমিকনেতা - মোশরেফা মিশু, ইসমাইল হোসেন, প্রকাশ দত্ত, জুলহাসনাইন বাবু, মীর মোফাজ্জল হোসেন মোস্তাক, ডা. শামসুল আলম ও তৌহিদুল ইসলাম প্রমুখ। সমাবেশ পরিচালনা করেন মশিউর রহমান খোকন। সমাবেশ থেকে ওই অঞ্চলে শোকদিবস পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, মাল্টিফ্যাবস লিমিটেড কারখানায় যে বয়লারটি বিস্ফোরিত হয়েছে তা মেয়াদোত্তীর্ণ ছিল। বয়লার চালু করার পর কয়েকবার সংকেত দিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শ্রমিকরা অভিযোগ করার পরও বয়লার অপারেটর তা চালু রাখেন এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় কর্মরত শ্রমিকদের শরীর। ইতোমধ্যে ১৩ জনের লাশ পাওয়া গেছে, এখনো নিখোঁজ আছে অন্তত ৩ জন। অসংখ্য আহত শ্রমিক ও পথচারীদের মধ্যে অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। বক্তারা বলেন, মালিক ও কর্তৃপক্ষের পরিষ্কার অবহেলার কারণেই এই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। ফলে একে কোনোভাবেই দুর্ঘটনা বলা যাবে না বরং এটা একটি নিশ্চিত কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড এবং এর দায়ভার কোনোভাবেই মালিক ও বয়লার পরিদর্শকরা এড়াতে পারেন না। ফলে অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করতে হবে এবং বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সমাবেশে *(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

পাহাড় ধস, হাওর অঞ্চলে বন্যা, চিকুনগুনিয়া

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা বলে সরকার দায় এড়াতে পারে না

ঢাকা শহরে এই দৃশ্যগুলো খুব পরিচিত। সারি সারি ফ্লাইওভার, সুউচ্চ অট্টালিকা, কোটি টাকার বিলাসবহুল প্রাইভেট কার আর বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান। একটা স্লোগানও যে কারও চোখে পড়বে – 'উন্নয়নের গণতন্ত্র-শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র।' মন্ত্রী-এমপিদের মুখেও কেবল উন্নয়নের গল্প। তারা দলের লোক তাই হয়তো এমন বলতে পারেন। কিন্তু শুধু কি তারা? সরকারি- বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তি, প্রশাসনিক আমলা-পুলিশ-বিচারপতি-নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এমন অনেকে আছেন যারা সরকারের উন্নয়নের গুণগানে পঞ্চমুখ। উন্নয়নের এই প্রবল চিৎকারের পরও আরেকটা ছবি চোখ এড়ায় না। এটাও নিত্যদিনের ব্যাপার, সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত ভোগ করে। যেমন ঢাকা শহরে চলাচল করতে ২০ মিনিটের পথ হয়তো লেগে যাবে ২ ঘন্টা। এক প্রতিবেদন বলছে এ কারণে প্রতিদিন ৩২ লক্ষ কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে, মানুষের পায়ে হাঁটার গতি আর যান চলাচলের গতি এখন প্রায় সমান- ঘন্টায় ৭ কিলোমিটার! বেকারত্ব বাড়ছে তীব্রভাবে। সোনার হরিণ চাকুরির পিছনে ছুটছে লক্ষ লক্ষ অনার্স-মাস্টার্স পাশ করা তরুণ-তরুণী। আরেকটি প্রতিবেদন বলছে, নির্দিষ্ট কোনো কাজ নেই এমন মানুষের সংখ্যা এখন প্রায় ৭১ লাখ। শ্রমশক্তির কী নিদারুণ অপচয়! পারিবারিক-ব্যক্তিগত জীবনে হতাশা-কলহ বাড়ছে আশঙ্কাজনকভাবে। একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য বলছে, প্রতি মিনিটে ১৩৮৯ পিস ইয়াবা বিক্রি হচ্ছে। জীবনের সকল কৌতূহল, সাধ-আহ্লাদ ভুলে গিয়ে তরুণ-তরুণীরা ডুবে যাচ্ছে নেশার নীল জগতে। দেশের সাধারণ মানুষের যখন এই অবস্থা তখন উন্নয়নটা হচ্ছে কার?

উন্নয়নের এই ধাক্কা বোধ হয় সবচেয়ে বেশি লেগেছে রাজধানী ঢাকার বুকে। দেশের বড় বড় ধনীদের বাস এই শহরে; তাদের বিত্ত-বৈভবের প্রকাশ আকাশ ছোঁয়া। কোটি কোটি টাকার *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির সংবাদ সম্মেলন

সারা দেশে অক্টোবর বিপ্লব উদ্‌যাপন কর্মসূচির ঘোষণা

অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির উদ্যোগে এক সংবাদ সম্মেলন ১২ জুলাই সকাল ১১টায় রাজধানী ঢাকার পুরানা পল্টনস্থ মুক্তি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিকের সভাপতিত্বে এই সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। আজফার হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কমিটির সমন্বয়ক হায়দার আকবর খান রনো, সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাসদের সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান, গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকী, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, জাতীয় গণফ্রন্টের সমন্বয়ক টিপু বিশ্বাস, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, বাসদ(মার্কসবাদী)র কেন্দ্রীয় নেতা মানস নন্দী, গরীব মুক্তি আন্দোলনের নেতা শামসুজ্জামান মিলনসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও শ্রেণি পেশার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে রুশ দেশে যে বিপ্লব ঘটেছিল তা পৃথিবীকে চমকে ও বদলে দিয়েছে। রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষ লেনিন ও বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল। বহুকাল ধরে মানুষ সাম্য, মৈত্রী, ইনসাফের যে সমাজের স্বপ্ন দেখে এসেছে, অক্টোবর বিপ্লব সেই স্বপ্নকেই বাস্তবায়ন করার কাজ করেছে এবং (৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভারতে বিজেপির গো-রক্ষার রাজনীতি

সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আড়াল করতে চায় গণবিরোধী দুঃশাসন

"এমন নয় যে, তারা সৈনিক ছিলো; যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছে। তারা ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় নিহত সাধারণ নাগরিকও নয়। তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী বা বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সদস্যও নয় যে, রাষ্ট্রীয় শক্তির হাতে নিষ্পেষিত হয়েছে। তারা আমাদের অংশ ছিলো, বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক ছিলো। কিন্তু তাদের খুঁজে খুঁজে, পিটিয়ে ও নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে। . . . ." 'ইন্ডিয়া টুডে' পত্রিকায় এক লেখায় দময়ন্তি দত্ত ও কৌশিক ডেকা মর্মস্পর্শী ভাষায় ভারতের বর্তমান সাম্প্রদায়িকতা ও অসহিষ্ণুতার পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন (দৈনিক সমকাল ২১ জুলাই ২০১৭)। যে বর্ণনা তারা দিয়েছেন, এ ভাবা যায় না। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এটি ক্রমে বেড়েই চলেছে।

২০১৫ সালে উত্তর প্রদেশের দাদরিতে ঘরে গরুর মাংস রেখেছে এই সন্দেহে মোহাম্মদ আখলাক নামে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে গো-রক্ষকেরা। এ পর্যন্ত পিটিয়ে মারার অন্তত ৫০টি ঘটনা ঘটেছে ভারতের ১১টি রাজ্যে(সমকাল ২১ জুলাই পৃষ্ঠা ১০)। যারা এর প্রতিবাদ করেছেন, ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতির এই হিংস্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছেন, ধর্মকে রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে যুক্ত না করে নিজ নিজ বিশ্বাসের জায়গায় রাখার জন্য যারা সোচ্চার হয়েছেন- তারাও তালিকা থেকে বাদ পড়েননি। তাদেরও হত্যা করা হয়েছে। . . . . . .

হঠাৎ করে গরু নিয়ে এরকম উত্তেজনা তৈরি করার পেছনে ধর্ম রক্ষার কোন ব্যাপার নেই, একথা ভারতের অনেকেই ধর্মীয় পুঁথি-পুস্তক তুলে ধরে ধরে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। এর পেছনে অন্য উদ্দেশ্য আছে। ভারত একটা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। সেদেশের জনজীবনের সংকট দিন দিন বাড়ছে। মূল্যবৃদ্ধি-বেকারত্বের চাপে সেদেশের জনগণ দিশেহারা। দারিদ্র্য ও ঋণের চাপে কৃষকদের আত্মহত্যা করার ঘটনা দু'চারদিন পরপরই পত্রপত্রিকায় আসে। মিডিয়ায় আসা খবর হিসেব করলেই বোঝা যায় সেদেশের সাধারণ মানুষের পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ, অথচ প্রকাশিত খবর তো বাস্তব অবস্থার ছোট একটি অংশের প্রকাশমাত্র- প্রকৃত পরিস্থিতি আরও খারাপ। বিজেপি সরকার দেশের এইরকম সংকটের মুখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনগণকে 'আচ্ছে দিন' আনার ভরসা দিয়েছিল। বুর্জোয়া মিডিয়ার প্রবল প্রচারে মানুষও সেটি বিশ্বাস করেছিল। ফলে গত নির্বাচনে বিরাট ব্যবধানে ভোটে বিজয়ী হয় বিজেপি।

কিন্তু ব্যবস্থাই যেখানে সংকটের জন্ম দেয় সেখানে ব্যবস্থাকে বহাল রেখে সংকটের সমাধান কোনোভাবেই সম্ভব হতে পারে না। অল্পদিনেই বিজেপি সম্পর্কে মানুষের মোহমুক্তি ঘটেছে। আর বিজেপিও বুর্জোয়া ব্যবস্থার সংকটকে আড়াল করার জন্য চিরাচরিত অস্ত্র ধর্মকে ব্যবহার করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ ব্যাপারে আগে থেকেই দক্ষ ছিলেন। তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে ২০০৪ সালে সেখানে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত করেন। হাজার হাজার লোক সে দাঙ্গায় নিহত হয়েছিল। তার নেতৃত্বে বিজেপি এবার তাদের দক্ষতার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটাতে লাগলো।

ফলস্বরূপ তৈরি হলো অসহিষ্ণুতা, অবিশ্বাস, উগ্রতা। মানুষের ঐক্যে ফাটল ধরা শুরু হলো। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, অনাহার এগুলোতে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নেই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। যারা ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না, ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, সব হারিয়ে গ্রাম থেকে শহরে পাড়ি জমাচ্ছেন- তারা কোনো বিশেষ ধর্মের মানুষ নয়। সবাই এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, নারী-পুরুষ-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিষময় ফল ভোগ করছেন।

তাই এই অভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তির রাস্তাও অভিন্ন, ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ভেদে তা ভিন্ন হতে পারে না। দরকার ঐক্যবদ্ধ লড়াই। শাসকগোষ্ঠী এই ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের শক্তিকে দুর্বল করতে চায়, মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে রাখতে চায়। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ভেদে এই বিভক্তি সৃষ্টি করলে শ্রমজীবী মানুষ একে অপরকে শত্রু ভেবে পরস্পর লড়ালড়ি করে, নিজেদের শক্তিক্ষয় করে। তাতে শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা আড়ালে চলে যায়। তারা বুঝতে পারে না হিন্দুর শত্রু মুসলমান বা মুসলমানের শত্রু হিন্দু নয়- উভয়ের মূল শত্রু পুঁজিবাদ। মোদী ও তার দল বিজেপির এ (৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org